HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০১ শিল্প

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: শিল্প
টপিক ০২: বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
টপিক ০৩: বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস
টপিক ০৪: রপ্তানিমুখী শিল্প
টপিক ০৫: রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক
টপিক ০৬: আমদানি বিকল্পশিল্প
টপিক ০৭: শিল্পায়নে সরকারি নীতিঃ সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব
টপিক ০৮: সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পায়নে সরকারি নীতির যথার্থতা
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিল্প

ভূমিকা (Introduction): সুপ্রাচীনকাল হতে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে চাহিদার ক্রমবিবর্তনে শিল্পের আবির্ভাব। এ যাত্রাপথে প্রথমে ঘটেছে কৃষি বিপ্লব যা যুগিয়েছে শিল্পের কাঁচামাল। কর্মচঞ্চল মনের তাড়নায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিভিন্ন আবিষ্কার শিল্পে এনেছে বিপ্লব। একই সাথে চলছে মানবসম্পদের দক্ষতার বিকাশ, তৈরি হচ্ছে শিল্পোদ্যোক্তা। বাংলাদেশও এপথে অগ্রসর হতে পারে যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, অবাধ মূলধনের প্রবাহ, উন্নয়নমনস্ক জনগণ যদি সম্মিলিতভাবে বিনিয়োগের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ রচনা করতে পারে।

শিল্প

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প (Industry) বলা হয়। অধ্যাপক Jean Robinson বলেন, 'একই বাজারে একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মের সমষ্টিই হচ্ছে শিল্প।' উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের মেরামত, পুনঃসংস্কারসাধন ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক কাজসমূহও শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। অন্যভাবে বলা যায়, যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় অর্থাৎ, কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরের সেসব কর্মসেবাকে শিল্প বলে। বাংলাদেশের সকল কাগজ কল বা সকল গার্মেন্টস কারখানাকে যথাক্রমে কাগজশিল্প বা গার্মেন্টসশিল্প হিসেবে অভিহিত করা যায়। ২০২২-২৩* অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৯৭.৩৫ ভাগ হলো শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি আয়।

শিল্প

শিল্পের বৈশিষ্ট্য: শিল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১. কোনো নির্দিষ্ট শিল্পে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একাধিক।

২. শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।

৩. শিল্পের পরিধি ব্যাপক এবং পণ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

৪. ফার্মের তুলনায় শিল্পের যোগান অধিক।

৫. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু একচেটিয়া বাজারে এরূপ পার্থক্য নেই।

৬. শিল্পের চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০২ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত ও দুর্বল। ব্রিটিশ সরকার প্রায় ১৯০ বছর এবং পাকিস্তান সরকার প্রায় ২৪ বছর বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করে। এ সময়ে তারা বাংলাদেশকে কাঁচামালের উৎস ও নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে ঐ সময়ে এদেশে কোনো বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এমনকি তারা আমাদের কুটিরশিল্পগুলোকেও সমূলে ধ্বংস করে দেয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিদেশি মালিক, শ্রমিক, ব্যবস্থাপক ব্যাপকভাবে দেশ ছেড়ে যাওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এ শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সরকার এদেশে বৃহদায়তনশিল্পসমূহকে জাতীয়করণ করে নেয়। ১৯৭৩ সালের ৩০ জুনের হিসাব অনুযায়ী ৩১৩টি কারখানা নিয়ে দেশের শিল্পখাতের যাত্রা শুরু হয়। এটি শুধু সরকারের হাতে থাকা শিল্পকারখানার সংখ্যা, বেসরকারি খাতে তেমন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯৮৬ সাল নাগাদ এ জাতীয়করণকৃত শিল্পসমূহ প্রচুর পরিমাণে লোকসানের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৬ সালে "শিল্পনীতি ১৯৮৬" ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পসমূহকে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে শুরু করলে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফাস্ফীতি ঘটে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

এ ধারাবাহিকতায় দেশে দ্রুত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্যে ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৫, ২০১০, ২০১৬ এবং ২০২২ সালে নতুন নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। সরকার শিল্পনীতির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে শিল্পখাতের বিকাশ ঘটেছে। শিল্পকারখানার সংখ্যা এখন প্রায় দেড়শ গুণ বেড়েছে। বর্তমানে উৎপাদনমুখী কলকারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অতিক্ষুদ্র শিল্প ২৩,৩০৬; ক্ষুদ্র শিল্প ১৬,৭৭০; মাঝারি শিল্প ৩,১৭৮ এবং বৃহৎশিল্প ২,৮৫৬টি। এগুলো হচ্ছে এখন শিল্প খাতের মেরুদণ্ড। "১ শিল্পখাতের উন্নয়নে মূলত চারটি কারণ প্রভাব ফেলেছে। সেগুলো হলো-(ক) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাণিজ্য সুবিধা, (খ) শ্রমশক্তির প্রাপ্যতা, (গ) উদ্যোক্তা শ্রেণির আগ্রহ ও (ঘ) সরকারি নীতি।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পখাত পাঁচটি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

ক. ম্যানুফ্যাকচারিং যেমন- (i) বৃহৎশিল্প, (ii) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প (iii) কুটিরশিল্প।

অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা, যেমন- (i) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল এবং (ii) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও কয়লা।

খ. গ. বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা।

ঘ. পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম। এবং

ঙ. নির্মাণ।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

বাংলাদেশের শিল্পখাত অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। স্বাধীনতা লাভের পর হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) কৃষি ও শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ৬২ ও ৪ শতাংশ। পরবর্তীকালে কৃষির অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্পের অবদান ২৯ শতাংশ যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৭.৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়। নিম্নে GDP তে শিল্প (ম্যানু.) খাতের অবদান দেখানো হলো:

খাত	১৯৭৩–৭৪	১৯৭৬–৭৭	১৯৮০–৮১	২০১২–১৩
শিল্প (ম্যানু)	১১.৭	১১.১	১০.৫	১৯.০০
(ক) বৃহদায়তনশিল্প	৫.৯	৫.৪	৫.৪	১৫.৪৯
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৫.৮	৫.৭	৫.১	৩.৫১

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

পরবর্তী সময়ে বৃহদায়তনশিল্পের সাথে ছোট, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সমন্বয়ে নতুন কাঠামোর সূচনা হয়। বর্তমানে, দেশজ উৎপাদনে শিল্পের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার : (কোটি টাকা)

শিল্প	২০১৬–১৭	২০১৮–১৯	২০২১–২২	২০২৩–২৪
কুটিরশিল্প	৭৮,৮২৯ (৯.২৯)	৯৬,৭০৪ (১৪.১৭)	১,২২,৮৪৭ (১১.১২)	১,৪৩,৩৫১ (৬.০৮)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প	১,৪২,১০২ (১০.০৬)	১,৭৪,৬৩২ (১০.৬১)	২,১৪,১২৬ (৪.৮৪)	২,৪৯,৬৯৬ (৬.৮৪)
বৃহৎশিল্প	২,৩১,৩৮৮ (১১.০৮)	২,৮৯,৮৮৫ (০.৪১)	৩,৭২,৪৫২ (১৫.৬৮)	৪,৩০,৩২০ (৬.৬০)
মোট	৪,৫২,৩১৯ (৭.০৯)	৫,৬১,২২০ (১২.৩৩)	৭,০৯,৪২৫ (১১.৪১)	৮,২৩,৩৬৭ (৬.৫৮)

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪; বন্ধনীর ভেতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোকে নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

(i) শিল্পের উপখাত: বাংলাদেশে শিল্পখাত বলতে প্রধানত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে বোঝায়। পূর্বে এ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যথা- (ক) বৃহদায়তনশিল্প ও (খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। বর্তমানে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ৩টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো- (ক) বৃহৎশিল্প, (খ) ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্রশিল্প এবং (গ) কুটিরশিল্প। শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ কোটি টাকার অধিক (সেবা ক্ষেত্রে ৩০ কোটি টাকার অধিক), তাকে বৃহৎশিল্প বলে। মাঝারিশিল্পে একই হিসেবে বিনিয়োজিত মূলধন ১৫ থেকে ৫০ কোটি (সেবাখাতে ২ থেকে ৩০ কোটি) টাকা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে একই হিসেবে বিনিয়োজিত মূলধন ৭৫ লক্ষ টাকা হতে ১৫ কোটি টাকা (সেবাখাতে ১০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা) হবে। এছাড়া ছোট শিল্পে এরূপ বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা (সেবাখাতে ১০ লক্ষ টাকার নিচে) এবং কুটিরশিল্পে বিনিয়োজিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকার নিচে হবে।

(ii) ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্প (SME): বর্তমানে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পকে (Small and Medium Enterprises-SME,) নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

(iii) পণ্য উৎপাদন: বাংলাদেশের শিল্পকারখানায় স্বল্প পরিমাণে মূলধনী পণ্য অধিক পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয়। এছাড়া কিছু শিল্পকারখানায় মাধ্যমিক পণ্যও উৎপাদিত হয়। যেমন- তুলা, ধান, গম, পাট প্রাথমিক পণ্য; সুতা, আটা, ময়দা মাধ্যমিক পণ্য এবং কাপড়, তৈরি পোশাক, ব্রেড, বিস্কুট চূড়ান্ত পণ্য বা ভোগ্যপণ্য। অন্যদিকে মূলধনী পণ্য বলতে ফার্নিচার তৈরির যন্ত্রপাতি, গাড়ির ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, পানির পাম্প ইত্যাদি। প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব, পর্যাপ্ত মূলধনের ঘাটতি, সুদক্ষ উদ্যোক্তার অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে মূলধনী পণ্য উৎপাদনী খাত তেমন অগ্রসর হতে পারেনি। এ কারণে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের ওপর আমরা নির্ভরশীল এবং বাংলাদেশে ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠা প্রায় দুরূহ।

(iv) মালিকানার ধরন: স্বাধীনতার পর এদেশের সকল বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকার রাষ্ট্রীয়করণ করে। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে দেশের শিল্পাঙ্গনে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শিল্প ছাড়া অন্য সকল শিল্প বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২০১০ সালের শিল্পনীতিতে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতের গুরুত্বকে স্বীকার করে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক নতুন শিল্পায়ন নীতিমালা ঘোষণা করে। এক্ষেত্রে সরকারি যৌথ উদ্যোগে কোনো শিল্প প্রকল্প চালু হলেও নির্দিষ্ট সময় পর তা বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের নীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ এদেশের শিল্পখাতে দ্বৈত মালিকানা (Dual Ownership) রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

(v) কর্মসংস্থান: মোট শিল্পোৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ বৃহদায়তনশিল্পে উৎপাদিত হলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব কম নয়। স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প দক্ষতায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন করা যায় বিধায় এক্ষেত্রে মোট শিল্প শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত থাকে। সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট শ্রমশক্তির কৃষিতে ৬৩.২%, শিল্পে ৭.৭% নিয়োজিত যা ২০১৬-১৭ সালে কৃষিতে ৪০.৬% এবং অকৃষিতে (শিল্প ও সেবা) ৫৯.৪%, এর মধ্যে শিল্পে ২০.৪% এবং সেবাখাতে ৩৯% এ উপনীত হয়।*

(vi) পরিবেশবান্ধব: শিল্পায়ন উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এজন্য সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করছে এবং উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সাথে দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা-উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণশিল্প, পর্যটন ও সেবাশিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো

(vii) নারীদের প্রবেশাধিকার: শিল্পনীতি ২০১০, ২০১৬ এবং ২০২২ এ, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

(viii) গুরুত্ব অনুযায়ী বিভাজন: বস্ত্র ও পোশাক, তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি শিল্প, চামড়া, পাট, চা বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এখানে শিল্প শ্রমিকের প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়োজিত। এছাড়া বর্তমানে খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকরণ, হাল্কা প্রকৌশল এবং জাহাজনির্মাণ শিল্পও দ্রুত বিকাশমান শিল্প হিসেবে বিবেচিত। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতের মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে সর্বাধিক শ্রমিক নিয়োজিত। এ ছাড়া বাঁশ ও বেতশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্পও গ্রামগঞ্জে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

(ix) উৎপাদন কৌশল: বৃহদায়তনশিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত। এখানে শ্রমনিবিড় (Labour intensive) প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বৃহদায়তনশিল্পের বস্ত্রখাতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রাধান্যও রয়েছে। মূলধন নিবিড় (Capital intensive) ভারীশিল্পের অভাবে বাংলাদেশের শিল্পখাত তত শক্তিশালী হতে পারেনি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পখাত তিনভাগে বিভক্ত। যথা- (১) ভোগ্যপণ্যের শিল্প, (২) মধ্যবর্তী পণ্যের শিল্প এবং (৩) মূলধন দ্রব্যের শিল্প। শিল্পখাতে মোট মূল্য সংযোজনে ভোগ্যপণ্য শিল্পের অবদান প্রায় ৫৫ ভাগ, মধ্যবর্তী পণ্যশিল্প প্রায় ৪২ ভাগ এবং মূলধনী দ্রব্য শিল্প মাত্র ৩ ভাগ। মালিকানার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো হলো: (ক) দেশীয় মালিকানা, (খ) বিদেশি মালিকানা এবং (গ) দেশি-বিদেশি যৌথমালিকানা। এছাড়াও, (i) বেসরকারি মালিকানা, (ii) সরকারি মালিকানা এবং (iii) সরকারি-বেসরকারি যৌথমালিকানা বিদ্যমান।

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১০" নামে একটি যুগোপযোগী শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্যদূরীকরণ। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্পনীতি-২০১০ এর আলোকে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে নয়ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) বৃহৎশিল্প, (ii) মাঝারিশিল্প, (iii) ক্ষুদ্রশিল্প, (iv) মাইক্রোশিল্প, (v) কুটিরশিল্প, (vi) হাইটেকশিল্প, (vii) সংরক্ষিতশিল্প, (viii) অগ্রাধিকারশিল্প এবং (ix) নিয়ন্ত্রিতশিল্প।

(i) বৃহৎশিল্প : ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "বৃহৎশিল্প" (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (replacement cost) ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "বৃহৎশিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। ইস্পাত ও লৌহশিল্প, বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, চিনিশিল্প ইত্যাদি বৃহৎশিল্প হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

(ii) মাঝারিশিল্প: ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "মাঝারিশিল্প" (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "মাঝারিশিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০-১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারিশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

(iii) ক্ষুদ্রশিল্প: ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্রশিল্প" (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫-৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।

সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে "ক্ষুদ্রশিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০-২৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারিশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারিশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

(iv) মাইক্রোশিল্প: "মাইক্রোশিল্প" (Micro Industry) বা অতি ক্ষুদ্রশিল্প বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০-২৪ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

(v) কুটিরশিল্প : "কুটিরশিল্প" (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যবিশিষ্ট সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০ এর অধিক নয় এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

(vi) হাইটেকশিল্প : "হাইটেকশিল্প" বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

কোনো একটি শিল্পকারখানা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্পের বেলায় যেকোনো বিনিয়োগ সীমা হলেও তার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিক পোষক কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

(vii) সংরক্ষিতশিল্প: সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যেসব শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিতশিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। বাংলাদেশে সংরক্ষিতশিল্পসমূহ হলো- (i) সামরিক সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি, (ii) পারমাণবিক শক্তি, (iii) সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল এবং (iv) বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

(viii) অগ্রাধিকারশিল্প: "অগ্রাধিকারপ্রাপ্তশিল্প (Thrust Sector)" বলতে সে সমস্ত উদীয়মান শিল্পকে বোঝাবে যে সমস্ত শিল্পের প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্যবিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা/প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সরকার কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক নীতি সমর্থন যোগানো প্রয়োজন হয়। এ খাতে ৩১টি শিল্প রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

(ix) নিয়ন্ত্রিতশিল্প: প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন-সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা যাবে। সরকার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এ শিল্পের তালিকা প্রণয়ন করে। তবে বেসরকারি খাতে ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, আন্ডারগ্রাউন্ড রেল, মনোরেল, অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদি স্থাপন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে Private Sector Infrastructure Guidelines এ উল্লিখিত নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে এরূপ শিল্প স্থাপন করার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্যব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারিশিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বর্তমানে জিডিপি'তে শিল্প খাত ৫টি খাতের সমন্বয়ে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ৩টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত।

শিল্পনীতি-২০১৬ এর লক্ষ্য

ক. সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

খ. সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৯ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ, শ্রমশক্তির অবদান ১৮ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।

গ. শিল্পায়নের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে (inclusive growth) ভূমিকা রাখা।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্পনীতি-২০১৬ এর উদ্দেশ্য

১. শিল্প (উৎপাদন ও সেবা) প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত সৃষ্টি এবং দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা;

২. দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;

৩. ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারিশিল্পকে শিল্পায়নের মূল চালিকা হিসেবে বিকশিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি;

৪. রপ্তানিমুখী (Export-oriented) শিল্প স্থাপন ও বহুমুখীকরণ;

৫. টেকসই পরিবেশবান্ধব শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান;

৬. এলাকাভিত্তিক কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ, প্রাকৃতিক, সামুদ্রিক ইত্যাদি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষায়িত শিল্পের উন্নয়ন;

৭. শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগতমান উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৮. তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে দেশের শিল্পখাতকে সক্ষমকরণ;

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্পনীতি-২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

১. বৃহৎশিল্প : ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'বৃহৎশিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যেসব তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সেসব তৈরি পোশাকশিল্প বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সেবাশিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎশিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

২. মাঝারিশিল্প: ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'মাঝারিশিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারিশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

সেবাশিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারিশিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারিশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

৩. ক্ষুদ্রশিল্প: ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্রশিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানাভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

সেবাশিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্রশিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারিশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারিশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

৪. মাইক্রোশিল্প: 'মাইক্রোশিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

সেবাশিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রোশিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

৫. কুটিরশিল্প: 'কুটিরশিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।

কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রোশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬. হস্ত ও কারুশিল্প: 'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদিত হয়।

৭. হাইটেকশিল্প: 'হাইটেকশিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

৮. সৃজনশীল শিল্প: 'সৃজনশীল শিল্প' (Creative Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন: এ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড এ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভলেজার সফটওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং, সফটওয়্যার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

এ শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা হবে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

৯. সংরক্ষিতশিল্প: সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যেসব শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিতশিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সংরক্ষিতশিল্প খাতের উদাহরণ হলো: ১. অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ২. পারমাণবিক শক্তি, ৩. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল, ৪. বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

১০. উচ্চ অগ্রাধিকারশিল্প: উচ্চ অগ্রাধিকারশিল্প বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। উচ্চ অগ্রাধিকারশিল্পের উদাহরণ: ১. কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প, ২. তৈরি পোশাকশিল্প, ৩. আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প, ৪. ঔষধশিল্প, ৫. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, ৬. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ৭. পাট ও পাটজাত শিল্প।

১১. অগ্রাধিকারশিল্প: 'অগ্রাধিকারশিল্প' (Priority Sector) বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো কোনো শিল্পখাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। অগ্রাধিকারশিল্পের উদাহরণ: ১. প্লাস্টিকশিল্প, ২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ৩. জাহাজ নির্মাণশিল্প, ৪. পর্যটনশিল্প, ৫. হিমায়িত মৎস্যশিল্প, ৬. হোম টেক্সটাইল সামগ্রীশিল্প, ৭. ভেষজ ঔষধশিল্প, ৮. হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ৯. হস্ত ও কারুশিল্প, ১০. চাশিল্প, ১১. বীজশিল্প, ১২. জুয়েলারি, ১৩. খেলনা, ১৪. আসবাবপত্রশিল্প, ১৫. সিমেন্টশিল্প।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্পনীতি ২০২২: শিল্পনীতি-২০১৬ এর সাথে শিল্পনীতি-২০২২ এর নিম্নোক্ত শিল্পসমূহের মিল রয়েছে। যেমন: বৃহৎশিল্প, মাঝারিশিল্প, কুটির শিল্প, হস্ত ও কারুশিল্প, হাইটেকশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, সংরক্ষিত শিল্প, অগ্রাধিকার শিল্প এবং নিয়ন্ত্রিত শিল্প।

শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে ১২ ভাগে ভাগ করা হলেও শিল্পনীতি ২০২২ এ শিল্পসমূহকে ১৭টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। ওপরের উল্লিখিত প্রকারভেদ ছাড়াও আরও যে সকল শিল্প রয়েছে; তা হলো-

ক্ষুদ্রশিল্প: ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্প (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৬-১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। সেবাক্ষেত্রের 'ক্ষুদ্রশিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

একই ভাবে, মাইক্রোশিল্প: ম্যানু, খাতে, স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১-২৫ জন শ্রমিক কাজ করে। সেবা ক্ষেত্রে, স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

ভারীশিল্প: ভারীশিল্প বলতে এরূপ শিল্পপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে বৃহৎ আকারের উদ্যোগ, বড় যন্ত্রপাতি, ভূমির বৃহৎ এলাকা, অধিক ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত থাকবে এবং যা হাল্কা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

উদাহরণস্বরূপ: জাহাজ নির্মাণশিল্প, পেট্রোলিয়াম পরিশোধনশিল্প, ইস্পাতশিল্প, মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্প, সিমেন্টশিল্প, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনশিল্প ইত্যাদি ভারীশিল্প হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্পখাত: রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্পখাত বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। যেমন: তৈরি পোশাক শিল্প, কৃত্রিম ফাইবার শিল্প, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ শিল্প, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, প্লাস্টিকশিল্প, চামড়াজাত শিল্প, পাটজাত শিল্প, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ নির্মাণশিল্প, ফার্নিচার শিল্প, হোম টেক্সটাইল শিল্প, একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (API) শিল্প, অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প, লজিস্টিকস শিল্প।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পখাত: বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পখাত বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যেসব শিল্পপণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয়, সে সকল পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যেমন: ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক শিল্প, সিরামিক শিল্প, মৎস্য শিল্প, প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং শিল্প, জুয়েলারি শিল্প, পেপার ও পেপার প্রোডাক্টস, রাবার শিল্প, রেশম শিল্প, হস্ত ও কারু শিল্প, তাঁতজাত শিল্প, সোলার এনার্জি, কাজু বাদাম (কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত), জীবন্ত ও প্রক্রিয়াজাত কাঁকড়া, খেলনা শিল্প, আগর শিল্প, হালাল মাংস ও মাংসজাতপণ্য, রিসাইকেল্ড পণ্য প্রভৃতি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প: দেশের বিশেষ আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ নয় বা কর ও রাজস্ব আদায় খাতে অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক নিবন্ধিত নয় এমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত (Informal Sector) বলা হয়। বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত রাষ্ট্র কর্তৃক পদ্ধতিগতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত নয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

পর্যটন শিল্প: পর্যটন শিল্প হলো এক ধরনের বিনোদন, অবসর সময়ে অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ। সামগ্রিকভাবে পর্যটন শিল্প বলতে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ভ্রমণ, চারু ও কারু শিল্পের ঐতিহ্য ও স্থাপনা দর্শন, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্যের দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ, বিভিন্ন প্রকার আবাসন এবং চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝাবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

২০২২ এর শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত হলো- বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পর্যটন শিল্প, হোম টেক্সটাইল, উইন্ড মিল, ভেষজ ঔষধ শিল্প, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, এলইডি, সিএফএল বাল্ব, বাল্ব উৎপাদন, চাশিল্প, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ, সিমেন্টশিল্প এবং লজিস্টিকস্ শিল্প খাত।

শিল্পনীতি-২০২২ এ সংরক্ষিত শিল্পসমূহ: অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি; পারমাণবিক শক্তি, সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল; বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

নোট: কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রয়োজ্য হবে না। একইভাবে কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তদ্রুপ, মাইক্রোশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

শিল্পনীতি-২০২২ এর উদ্দেশ্য:

১. অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতের উন্নয়ন;
২. নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (শিল্পায়নে স্টার্ট-আপ);
৩. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ;
৪. অনগ্রসর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
৫. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা;
৬. উৎপাদনশীলতাকে বৈশ্বিক প্রতিযোগী স্তরে উন্নয়ন;
৭. পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা;
৮. আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে বিশেষ প্রণোদনা;
৯. শিল্পপণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যায়নে সহায়তা;

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

১০. রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণ;
১১. বিদেশি বিনিয়োগের প্রসার;
১২. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তির প্রসার;
১৩. পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা;
১৪. দক্ষতা উন্নয়ন: দক্ষ জনশক্তি চাহিদা ও সরবরাহ তথ্যভাণ্ডার;
১৫. শিল্পনীতি-২০২২ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে একটি 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ।

THANK YOU

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

শিল্প কাঠামো বলতে কোনো দেশের শিল্পের প্রকৃতি ও আয়তন, ব্যবহৃত প্রযুক্তির ধরন, উপকরণের ধরন ও দক্ষতা, উদ্যোক্তার ধরন ও দক্ষতা, শ্রম পরিবেশ ও মজুরি, উৎপন্ন দ্রব্য, শিল্পের সামগ্রিক পরিবেশ ইত্যাদির সংঘবদ্ধ রূপকে বোঝায়। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন হতে বর্তমান পর্যন্ত শিল্প কাঠামোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

১. দ্বৈতমালিকানা (Dual Ownership): বাংলাদেশের শিল্পখাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার মালিকানা বিদ্যমান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার দেশ পুনর্গঠনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে। তবে ১৯৮০ এর দশক হতে বেসরকারি মালিকানায় শিল্পখাতের প্রসার ঘটে।

২. পুঁজির স্বল্পতা: বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য যে ধরনের উন্নত মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজার প্রয়োজন ছিল তা এখনো গড়ে ওঠেনি। ব্যাংক, বিমা, মূলধন বাজার যেমন শেয়ার মার্কেট যথেষ্ট দুর্বল। তাই এদেশে শিল্পখাতে পুঁজির স্বল্পতা বিদ্যমান।

৩. মূলধনীশিল্প বা ভারীশিল্প: কল-কজা, যন্ত্রপাতি, উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভরশিল্প তথা মূলধনীশিল্পে বাংলাদেশ অনেক দুর্বল। এখানে মূলত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য হালকা কিছু শিল্প স্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৪. বৃহদায়তনশিল্পের প্রসার: বর্তমান শিল্পনীতি-২০২২ অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার অধিক এবং নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৩০০ জনের অধিক হলে সেটি বৃহৎশিল্প হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বিগত দু'দশকে এ খাতের প্রসার ঘটেছে। বস্ত্র ও পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, পাট, চামড়া, চিনি, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণশিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ ও উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভরশিল্প প্রভৃতি খাতে বৃহদায়তনশিল্প গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রায় ২০ শতাংশ এখানে কর্মরত।

৫. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব হ্রাস: ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বিগত এক দশক যাবৎ এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার তেমন আশাব্যঞ্জক ছিল না। কিন্তু এ খাতে নিয়োজিত অদক্ষ, স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা দক্ষ শ্রমিকের তুলনায় অধিক। শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রায় ৮০ শতাংশ এখানে কর্মরত। এটি শ্রমঘন খাত।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৬. ক্ষুদ্র-মাঝারিশিল্পের বিকাশ: বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পখাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।দারিদ্র্যবিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্পনীতি-২০১০ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পকে (SME) অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এসএমই খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণ ও অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যদূরীকরণে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ শিল্পে অন্তর্ভুক্ত হলো খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, মেটাল শিল্প, সিরামিক শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কলম শিল্প, সাবান শিল্প ইত্যাদি।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৭. রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যর্থতা ও বেসরকারি খাতের প্রাধান্য: রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে বিশেষত বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং সেবাখাতে বিদ্যমান সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও সামগ্রিক অবস্থা তত আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে প্রায় প্রতি বছরই এ খাত হতে মুনাফা অর্জিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ সম্পর্কিত একটি প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় যে, ২০২৪ সালে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (SMSME) খাতে যে ঋণ বিতরণ করা হবে, তার ৫০ শতাংশ দিতে হবে কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে। আর নারী উদ্যোগে দিতে হবে ১৫% ঋণ।** ২০২১-২২ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (২১ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ জমার পরিমাণ যথাক্রমে ৮৭৯.৮৫ এবং ১০৩৭.২২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলো শক্তিশালী বেসরকারি খাত। বর্তমানে বাংলাদেশের বার্ষিক স্কুল দেশজ উৎপাদন (GDP)-এ বেসরকারি খাতের অবদান শতকরা ৮৫ ভাগের অধিক। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৮. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)*: বিশ্বব্যাংক ও IFC প্রকাশিত Doing Business 2020 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, কর প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্য, চুক্তি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬তম। উল্লিখিত সূচকের উন্নতি ঘটলে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ :

সাল	২০০৫	২০১৬	২০১৮	২০২১	২০২২	২০২৩*
FDI/ মিলিয়ন মা. ডলার	৮৪৫	২৩৩৩	৩৬১৩.৩	৩৯৯৫.৫৬	৩৪৭৯.৯৫	২১১৫.৯০

সূত্র : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক; * সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোয় শ্রমনিবিড় (শ্রমঘন) শিল্পের প্রাধান্য বিদ্যমান। শিল্পকারখানার পরিবেশ পূর্বে অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর থাকলেও বর্তমানে এ অবস্থার অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ভারীশিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা বর্তমানে অনেক বেগবান হয়েছে।

** প্রআ, ১২ আগস্ট ২০২৩

FDI প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৩ দেশ (বিলিয়ন ডলার)		
দেশ	২০২২	২০২৩
যুক্তরাষ্ট্র	৩৩২	৩১১
চীন	১৮৯	১৬৩
সিঙ্গাপুর	১৪১	১৬০

বাংলাদেশ (কোটি ডলার)		
২০২১	২০২২	২০২৩
২৮৯ কোটি ডলার	৩৪৮ কোটি ডলার	৩০০ কোটি ডলার

সূত্র : আঙ্কটাড; প্রআ, ২২ জুন, ২০২৪

* FDI = Foreign Direct Investment (FDI)

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব বা ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো:

১. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্বল্প প্রযুক্তি, প্রচ্ছন্ন ও ঋতুগত বেকার সমস্যা বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের দ্বারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা যায়।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন (বিসিক**) দেশে বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশ এবং সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের আনুষঙ্গিক সহায়তা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২. কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস: বাংলাদেশের কৃষিতে যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ রয়েছে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এরূপ বাড়তি চাপ কমানো যায়।

৩. বিনিয়োগের সুবিধা: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনের জন্য খুব স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন নেই, স্বল্পতার দিক বিবেচনা করলে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে বিনিয়োগ সুবিধার কারণে দেশের উন্নয়ন সাধন করার উদ্যোগ নেওয়া যায়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব বা ভূমিকা

৪. স্ত্রীলোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি: আমাদের দেশের মেয়েরা অতিমাত্রায় পর্দাশীল। তাই ঘরের বাইরে পুরুষের সাথে কাজ করতে তারা ইচ্ছুক নয়। কিন্তু কুটিরশিল্পের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে পর্দাশীল স্ত্রীলোকদের এ কাজে লাগানো যায়।

৫. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ফলে জীবনযাত্রার মান ক্রমেই উন্নত হবে।

৬. সম্পদের সুষম বণ্টন: বৃহদায়তনশিল্পে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ধন বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসারের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস ও সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।

৭. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি সম্ভব। ফলে মুদ্রাস্ফীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব বা ভূমিকা

৮. বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় কুটিরশিল্পের সুবিধা হলো দেশের সীমাবদ্ধ উপকরণের দ্বারাই উৎপাদন চলতে পারে। বিদেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আমদানি করতে হয় না। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

৯. কাঁচামালের সদ্ব্যবহার: বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপিত হলে কাঁচামালের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে।

১০. জাতীয় ঐতিহ্যের রক্ষক: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের রক্ষক বলা যায়। এসব শিল্পের নৈপুণ্য বংশানুক্রমে চলে আসে। এজন্য এ ধরনের শিল্পকারখানাকে পুরানো ঐতিহ্যের জীবন্ত যাদুঘর হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

১১. রুচিমাফিক উৎপাদন: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে জনগণের রুচি ও চাহিদানুসারে দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়।

১২. গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ: বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হবে।

১৩. পরিবেশবান্ধব : বৃহদায়তনশিল্পের চিমনির ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থের দ্বারা পরিবেশ দূষিত হলেও ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পের এ সমস্যা নেই।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব বা ভূমিকা

১৪. উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার: বৃহৎশিল্পের অনেক পরিত্যক্ত উপজাতদ্রব্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৫. অধিক স্থায়িত্বতা: স্থানীয় চাহিদার পরিবর্তন না ঘটলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প টিকে থাকতে পারে। কিন্তু এ সময় বৃহৎশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৬. বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাংলাদেশের হস্তশিল্প, শঙ্খশিল্প এবং কারুকার্য করা অলঙ্কারের প্রচুর চাহিদা রয়েছে বিদেশে। এসব পণ্যদ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

১৭. অতিরিক্ত আয় অর্জন: কুটিরশিল্প গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি করে।

১৮. সুষম উন্নয়ন: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গ্রামাঞ্চলে প্রসার লাভ করলে সুষম উন্নয়ন সম্ভব হয়। কারণ বৃহৎশিল্প শুধু শহরকেন্দ্রিক স্থাপনের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

ওপরের আলোচনা থেকে এ ধারণা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এদেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের আরও প্রসার ঘটানো উচিত এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে একে পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যাবলি

অতীতকাল হতে বাংলাদেশের কুটিরশিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও নানাবিধ সমস্যার ভারে এ শিল্পের অস্তিত্ব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। কুটিরশিল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় সোয়া লক্ষ নতুন লোকের কর্মসংস্থান হয়। দারিদ্র্যদূরীকরণে পল্লির সবচেয়ে অবহেলিত মানুষ তথা ভূমিহীন ও মহিলাদের এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়ছে। এদেশে কুটিরশিল্পের গুরুত্ব এত বেশি থাকা সত্ত্বেও কুটিরশিল্পের সমস্যার অন্ত নেই। নিম্নে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যাবলি বর্ণনা করা হলো:

১. মূলধনের স্বল্পতা: বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো মূলধনের স্বল্পতা। ফলে কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

২. ঋণের অভাব: কুটিরশিল্পের জন্য দেশীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হলেও ঋণের অভাবে তা সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।

৩. প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি: বর্তমান যুগে কুটিরশিল্পে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যা হলো এক্ষেত্রে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যাবলি

৪. কাঁচামালের অভাব এদেশে উৎপন্ন কাঁচামালের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়। ফলে কুটিরশিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. শ্রমিকদের অশিক্ষা: বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা অশিক্ষিত। ফলে আধুনিক উৎপাদনের কলাকৌশল সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। তাই রুচি ও পছন্দমাফিক দ্রব্য উৎপাদনে তারা পারদর্শী নয়।

৬. কারিগরি জ্ঞানের অভাব: এদেশের কুটিরশিল্পের শ্রমিকরা নিরক্ষর, তাদের কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে আধুনিক রুচি ও ফ্যাশন অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না।

৭. স্বল্প মজুরি: কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি কম হয়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু হয়। এ কারণে অনেক সময় শ্রমিকেরা অন্য পেশায় চলে যায়।

৮. পরিবহণ ও যোগাযোগের সমস্যা: পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার অসুবিধার কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণে অনেক সমস্যা হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যাবলি

৯. সীমাবদ্ধ বাজার: দিন দিন কুটিরশিল্পের বাজার সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। বৃহৎশিল্পের অসম প্রতিযোগিতার ফলে কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

১০. শক্তি সম্পদের অপ্রাচুর্যতা: পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদের অভাবের কারণে (যেমন: কয়লা, খনিজ তেল এবং জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত) বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের আধুনিকীকরণ সম্ভব হচ্ছে না।

১১. নিম্নমানের পণ্যদ্রব্য: কুটিরশিল্পের শ্রমিকরা প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতিতে দ্রব্য উৎপাদন করে বলে উৎপাদিত পণ্যের মান হ্রাস পাচ্ছে। ফলে এর চাহিদাও হ্রাস পাচ্ছে এবং মূল্যও কমে যাচ্ছে।

১২. মধ্যবর্তী দালালদের প্রভাব এ শিল্পের অশিক্ষিত মালিকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় না করে মধ্যবর্তী দালালদের নিকট কম দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয় বলে পণ্যের ন্যায্যমূল্য হতে তারা বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যাবলি

১৩. সরকারি সহযোগিতার অভাব: সরকারি সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশে কুটিরশিল্পের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

১৪. বিদেশি পণ্যের অবাধ আমদানি বাংলাদেশে বিদেশি পণ্যের অবাধ আমদানির কারণে আমাদের কুটিরশিল্পপণ্যের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

১৫. সমবায়ী মনোভাবের অভাব: কুটিরশিল্পীদের সমবায়ী মনোভাবের অভাবের কারণেও এদেশে এ শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

১৬. আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব: বাংলাদেশে কুটিরশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদিও নিম্নমানের হয়।

১৭. ভোক্তাদের প্রতিকূল মনোভাব এদেশের কুটিরশিল্পের ভোক্তাদের চাহিদা, রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন এবং বিদেশি পণ্যের প্রতি আকৃষ্টতার কারণে দেশীয় শিল্পপণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

১৮. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসের অভাব: গ্রামীণ কুটিরশিল্পের মালিক-এর সহজশর্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার কোনো সুবিধা নেই।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের পণ্যসামগ্রী এককালে বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে কুটিরশিল্পের বিকল্প পণ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় অতীতের সেই ঐতিহ্য আর নেই। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থার উন্নতি করে কুটিরশিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করতে হবে:

১. আধুনিকীকরণ: বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

২. ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের মূল্যায়ন: বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভোক্তা বা ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের অবস্থা কী রকম, সেদিকে খেয়াল রেখে পণ্য তৈরি বা উৎপাদন করতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ: কুটিরশিল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূলধনের অভাব পূরণের জন্য সহজ শর্তে ও কম সুদে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার: দেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তিকে সবার ঘরে পৌছানো প্রয়োজন। কারণ বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কুটিরশিল্পের উৎপাদন খরচ অনেক হ্রাস পায়।

৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: কুটিরশিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের জন্য গ্রামাঞ্চলে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

৬. দক্ষতা বৃদ্ধি: মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, রেশমশিল্প ইত্যাদি শিল্পকারখানার শ্রমিকদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এতে করে পণ্যের মান উন্নত হবে এবং ভোক্তাদেরকে পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে।

৭. কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান: কুটিরশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

৮. টেকসই ও সস্তায় পণ্য উৎপাদন বৃহদায়তনশিল্প পণ্য যেন টেকসই এবং সস্তা হয়, সেদিকেও কুটিরশিল্পকে খেয়াল রাখতে হবে। নতুবা কুটিরশিল্পের বাজার আরও সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

৯. ঋণের যোগান: কুটিরশিল্প যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে, সেজন্য সমবায় ঋণদান সমিতিসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিধি পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে।

১০. মূল্যবান যন্ত্রপাতির ব্যবহার: বৃহৎশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার জন্য কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। এজন্য সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

১১. উৎপন্ন দ্রব্যের মান নির্ধারণ: কুটিরশিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. বাজারব্যবস্থার উন্নয়ন সমবায় বাজার সমিতি গঠন, বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজারব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

১৩. সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ সংরক্ষণ নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কুটিরশিল্পকে বিদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

১৪. ব্যাপক প্রচার: এ শিল্পজাত পণ্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমা হল প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাতে হবে।

১৫. পরিবহণব্যবস্থার উন্নয়ন: কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য দেশের পরিবহণব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হলে সহজেই কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বাজারজাতকরণ সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

১৬. বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা: কুটিরশিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত পুঁজি সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে কুটিরশিল্প বিষয়ক বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

১৭. দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ: দেশের জনগণকে স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৮. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: কুটিরশিল্পসমূহকে আরও অধিকতর উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন।

উপসংহারে বলা যায়, উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে কুটিরশিল্পের বর্তমান সমস্যাবলির সমাধান সম্ভব হবে। এর ফলে কুটিরশিল্পের প্রসার ঘটবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি SME বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান নামে নতুন একটি ধারণার সূচনা হয়েছে। এ খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল হতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পল্লি অর্থনীতির খামার বহির্ভূত ক্ষুদ্র এবং মাঝারিশিল্পে অর্থায়ন অনেকাংশে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয়ভিত্তিক হলেও বর্তমানে এ খাতের বিকাশে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন NGO এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থায়ন করছে। দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ছোট ও মাঝারি এ উদ্যোক্তারা হলো শিল্প খাতের প্রাণ। দেশে প্রায় ৭৫-৯০ শতাংশ শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান। GDP-তে এ খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ। এ খাতকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে SME সার্ভিস সেন্টার খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান

নিজগৃহে বসে নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এসএমই উদ্যোগ নিচ্ছে যা শিল্প ও সেবাখাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করছে। সারাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাস্টার' চিহ্নিত করে সেসব ক্লাস্টারে অর্থায়ন ও উন্নয়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-জামালপুরের নকশীকাঁথা, মনিপুরী তাঁত, সিরাজগঞ্জের তাঁত, রাঙামাটির তাঁত, মুন্সীগঞ্জের বাঁশ, বেত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অর্থায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েব মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সম্প্রতি 'উৎপাদন শিল্প জরিপ' এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা দেশে বর্তমানে ছোট কারখানা ২৩,৩০৬টি এবং মাঝারি কারখানা ৩,১৭৮টি। দেশের শিল্পকারখানায় মোট ৫৪ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এর মধ্যে ছোট কারখানায় ১০.৫ লক্ষ এবং মাঝারি কারখানায় ৫ লক্ষ। পদ্মা সেতু চালুর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, হালকা প্রকৌশলসহ ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি হলো।**

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান

ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্প উদ্যোগ খাতে স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করার মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রতি সরকার ও নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে বর্তমানে এ খাতে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, এডিবি তহবিল, জাইকা (Japan International Cooperation Agency-JICA) তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০২৩ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পখাতে ২,২৯,৩১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

শিল্পনীতি ২০১৬/২০২২ অনুসারে বৃহদায়তনশিল্পের সংজ্ঞা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া যায়। যেমন-

(ক) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ভিত্তিতে এবং

(খ) নন-ম্যানুফ্যাকচারিং (ট্রেডিং এবং অন্যান্য সেবা) খাতের ভিত্তিতে

(ক) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শিল্পের সংজ্ঞা: ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'বৃহৎশিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব

শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। আবার যেসব তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সেসব তৈরি পোশাকশিল্প বৃহৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

(খ) নন-ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শিল্পের সংজ্ঞা: সেবাশিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎশিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে যেসব বৃহৎশিল্প রয়েছে তার মধ্যে বস্ত্র, পাট, কাগজ, সার, সিমেন্ট, চিনি, এম.এস. রড, চা, পানীয়, সাবান ও ডিটারজেন্ট এবং চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি শিল্প প্রধান। শিল্পবিপ্লবের পর হতে বৃহদায়তনশিল্প উৎপাদনের গুরুত্ব ক্রমেই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ এর মাধ্যমে গড় উৎপাদন খরচ কম হয়, কম সময়ে অধিক পরিমাণের পণ্য উৎপাদন করে বিশ্বব্যাপী চাহিদার বিপরীতে যোগান দেয়া সম্ভব হয়। তাই এ শিল্পব্যবস্থার সুবিধার জন্য এর গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

বৃহদায়তনশিল্পের সুবিধা: বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান যেসব সুবিধা ভোগ করে তা নিম্নরূপ :

১. শ্রমবিভাগের সুবিধা: বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থায় সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে শ্রমিকদের দক্ষতানুযায়ী কাজ বণ্টন করে দেয়া হয়। ফলে উৎপাদনব্যয় হ্রাস পায় ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২. পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ: বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

৩. উন্নত উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের সুবিধা: যেহেতু বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান রয়েছে, তাই উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

৪. ক্রয়ের সুবিধা: বৃহদায়তন উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন হয়। এরূপ বিপুল পরিমাণ উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক আর্থিক সাশ্রয় হয়। এছাড়া এক সাথে অধিক দ্রব্য সংগ্রহ করায় পরিবহণ খরচও কম হয়।

৫. বিক্রয়ের সুবিধা: এরূপ প্রতিষ্ঠান যেহেতু কম সময়ে, কম খরচে ভালো মানের অধিক পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারে, তাই সস্তায় দ্রব্য বিক্রয় করা যায় বিধায় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

৬. ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস: বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষতি বা লোকসান হলেও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করে তা পূরণ করা যায়। অর্থাৎ এরূপ প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পায়।

৭. প্রচার সুবিধা: প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান অধিক প্রচার ও বিজ্ঞাপন সুবিধা ভোগ করে। এতে উৎপাদনের পরিমাণ যত বেশি হবে গড় প্রচার ব্যয় তত কম হবে।

৮. উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার: বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যে প্রচুর উপজাত দ্রব্যের সৃষ্টি করে তা পুনরায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে মূল কারখানার সাথে উপজাত শিল্প গড়ে তোলে। ফলে উপজাত দ্রব্যকে লাভজনক কাজে ব্যবহার করা যায়।

৯. শিল্পের স্থানীয়করণের সুবিধা: বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থার উদ্ভব হওয়ায় শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটেছে। ফলে এরূপ প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

১০. ব্যবস্থাপনা সুবিধা: এরূপ প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সুবিধা ভোগ করে থাকে। কারণ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন যে হারে বাড়ে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা ব্যয় সে হারে বাড়ে না।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

১১. দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ: বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়কার্য পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী এবং দক্ষ ম্যানেজার নিয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে।

১২. বিশেষীকরণের সুবিধা: বৃহদায়তনশিল্পের যতই প্রসার ঘটে, এর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্রব্যটির ভিন্ন ভিন্ন অংশ উৎপাদনে বিশেষায়িত হয়ে ওঠতে পারে। এর ফলে সমগ্র শিল্পই উপকৃত হয়।

১৩. সরকারি সাহায্য: বৃহদায়তনশিল্প প্রসার লাভ করলে, সরকারের পক্ষ থেকেও ঐ শিল্পের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন- ভর্তুকি, কর রেয়াত প্রভৃতি। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

১৪. গবেষণার সুবিধা: বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন পদ্ধতির জন্য গবেষণা চালাতে পারে এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়। ফলে সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থা উপকৃত হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

বৃহদায়তনশিল্পের অসুবিধা: বৃহদায়তনশিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে এ শিল্পের অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. পরিচালনার অসুবিধা: উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে, উপযুক্ত তদারকির অভাবে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিভা, দক্ষতা ও কর্মদক্ষতার একটা সীমা আছে যা মানুষ অতিক্রম করতে পারে না।

২. মূলধনের স্বল্প যোগান: বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় যা অনেক সময় ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক সংস্থা হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া অনেক সময় সুদের হার অত্যধিক বেশি হলে ঋণ গ্রহণের সমস্যা দেখা দেয়।

৩. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভালো নয়: এরূপ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের সাথে মালিক পক্ষের কোনোরূপ যোগাযোগ থাকে না বলে উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা খুব বেশি। অনেক সময় এর ফলে ধর্মঘট, লক-আউট প্রায় লেগেই থাকে।

৪. অপচয়: বৃহদায়তনশিল্প কারখানায় একা মালিকের পক্ষে সবকিছু সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। ফলে শ্রমিকরা কাজে অবহেলা করে এবং জিনিসপত্রের প্রচুর অপচয় হয়।

৫. দ্রব্যের অপর্যাপ্ত চাহিদা দ্রব্যের চাহিদা সীমাবদ্ধ হলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভবপর হয় না।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

৬. রুচিসম্মত উৎপাদন অসম্ভব: বৃহদায়তন উৎপাদনে একই প্রকার দ্রব্য যেহেতু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়, তাই বিভিন্ন মানুষের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয় না।

৭. একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি: এরূপ বাজারে অনেক সময় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারীরা চুক্তির মাধ্যমে কার্টেল বা একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের কষ্টও বৃদ্ধি পায়।

৮. ধনবৈষম্যের সৃষ্টি: এ প্রতিষ্ঠানের প্রসারের ফলে দেশের সমুদয় সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সমাজে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

৯. অধিক উৎপাদন সমস্যা: বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে বাজারে চাহিদা অপেক্ষা যদি শিল্পদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায় তবে অর্থনীতিতে 'অতি উৎপাদন সমস্যা' দেখা দিবে। এর ফলে মন্দাও ঘনীভূত হবে।

১০. ঝুঁকিবহুল কারবার এরূপ কারবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হলে চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বৃহদায়তনশিল্প

১১. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি: এরূপ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার খরচ বাবদ অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতাসাধারণের আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয়।

১২. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্ম: বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চালু করা হলে এর আশেপাশে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য বস্তি এলাকা গড়ে ওঠে পরিবেশ দূষিত করে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্ম দেয়।

উপসংহারে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধার তুলনায় সুবিধা অনেক বেশি। তাই বর্তমান সময়ে বৃহদায়তনশিল্প উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার ঘটছে এবং এর জনপ্রিয়তাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব

বৃহৎ বা বৃহদায়তনশিল্প বলতে বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুসারে, "যে শিল্পকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা-শ্রমঘন শিল্পে ১০০০ জনের অধিক এবং শ্রমঘন ছাড়া অপর শিল্পে ৩০০ জনের বেশি (সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে ১২০ জনের অধিক নিয়োজিত), তাকে বৃহদায়তনশিল্প বলে।" বৃহৎশিল্পের উন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়-এ সত্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ড, জাপান, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশে দ্রুত কৃষি উন্নয়নে বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত কৃষির আধুনিকীকরণ মোটেও সম্ভব নয়। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার প্রভৃতির যোগান শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল।

২. কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস: বাংলাদেশে প্রতি বছরই প্রায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অত্যন্ত অনিশ্চিত থাকে। অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে বাংলাদেশকে শিল্পায়িত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব

৩. বেকার সমস্যার সমাধান: বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী বেকার। এ বিশাল বেকার সমস্যার সমাধান করা একমাত্র দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব।

৪. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে শিল্প উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

৫. ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠা: দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা স্থাপিত হলে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রাও বেঁচে যাবে।

৬. শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও যানবাহনের প্রয়োজন। এসব অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য সর্বদা বিদেশের ওপর নির্ভর না করে দেশের অভ্যন্তরেই শিল্পকারখানায় প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ভারীশিল্প স্থাপন করা জরুরি।

৭. জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি: জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে দেশে বৃহৎশিল্পের দ্রুত উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব

৮. লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণ: আমাদের দেশের রপ্তানি বাণিজ্য কতিপয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল। এ সমস্ত পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে প্রায়ই ওঠানামা করে। এক্ষেত্রে রপ্তানিমুখীশিল্প স্থাপন করে লেনদেন ভারসাম্য অনুকূল করা যায়।

৯. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: সর্বশেষ ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১৮.৭% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে অবশ্যই শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।

১০. পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সরঞ্জামাদি দেশের অভ্যন্তরে শিল্পকারখানায় উৎপাদন করতে হবে।

১১. স্থিতিশীল অর্থনীতি: কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। সেই প্রেক্ষিতে শিল্পনির্ভর অর্থনীতি স্থিতিশীল অর্থনীতি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব

১২. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাশিত পরিমাণে তথা বেশি পরিমাণে অর্জন করা যায় না। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হলে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়।

১৩. আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন: বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির স্বল্পতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উচ্চ হওয়ায় এ বিশাল আয়তনের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল।

১৪. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন: যদিও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ খাত কৃষি কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দামের উত্থান-পতন প্রভৃতি নানা অনিশ্চয়তার কারণে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য শিল্পোন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশের বৃহৎশিল্পের গুরুত্ব

১৫. স্বনির্ভরতা অর্জন: বর্তমানে বিপুল পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করার কারণে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিপুল পরিমাণে আমাদের অপচয় হচ্ছে। এছাড়াও শিল্পপণ্যের জন্য আমরা বিদেশের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিতে যদি আমরা নিজ দেশেই প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করতে পারি, তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়সহ নানা ধরনের সংকট লোপ পাবে।

উপসংহারে বলা যায়, শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন ঘটলে কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং কাঁচামালের উপযুক্ত ব্যবহার ও পণ্যাদির ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। এছাড়াও শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০৪ রপ্তানিমুখী শিল্প

রপ্তানিমুখী শিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

রপ্তানিমুখী শিল্প

সম্পূর্ণরূপে বিদেশের বাজারে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দেশে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে শিল্পায়নকে রপ্তানিমুখীশিল্প বলে। যেসব দেশের আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় অধিক অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত থাকে, সেসব দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী ভিত-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটি দেশ যদি ক্রমাগত দীর্ঘকালব্যাপী বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভোগ করে, তখন সে দেশকে দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশ না বলে, উন্নত দেশ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অপেক্ষা আমদানি ব্যয় অধিক এবং ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি বিদ্যমান। এর কারণ হলো বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান এবং সস্তা শ্রমনির্ভর শিল্প উৎপাদনে জড়িত। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পের প্রাথমিক উপকরণ তথা কাঁচামাল (চামড়া, পাট ইত্যাদি) রপ্তানি করে। এসব পণ্যের দাম কম থাকে বিধায় আমাদের রপ্তানি আয় স্বল্প।

রপ্তানিমুখী শিল্প

রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের জন্য নিম্নোক্ত ধারণাসমূহ বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। যেমন-

(i) নিজেদের উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে উৎপাদনক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা (Comparative Cost Advantage) ভোগ করে কি-না?

(ii) বিভিন্ন দেশের জনগণের চাহিদা, চাহিদার বৈচিত্র্য, বাজারব্যবস্থা, জনগণের জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(iii) আন্তর্জাতিক মানের শিল্পায়নের পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ, দেশি-বিদেশি পুঁজি আহরণ, দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সুনিপুণ শ্রমশক্তি, মূলধনী দ্রব্য ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(iv) প্রয়োজন-স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক জোটের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন, উপযুক্ত শুল্কব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা।

রপ্তানিমুখী শিল্প

গত দু'দশকে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখীশিল্পের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

শিল্পজাত	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির অংশ			
পণ্য রপ্তানির তালিকা	১৯৯২/৯৩	২০০৯/১০	২০১৭/১৮	২০২২/২৩	১৯৯২/৯৩	১৯৯৪/৯৫	২০০৯/১০	২০১৭/১৮*
১. তৈরি পোশাক	১২৪০.৪৮	৬০১৩.৪৩	১৫৪২৬	২১২৫৩	৫২.০৭	৫২.৮৫	৩৭.১১	৪১.৫২
২. নিটওয়্যার	২০৪.৫৪	৬৪৮৩.২৯	১৫১৮৯	২৫৭৩৮	৮.৫৯	১১.৩২	৪০.০১	৪১.৫১
৩. রাসায়নিক দ্রব্য	৫১.১৮	১০২.৮৭	১৫১	৩০৩	২.১৫	২.৯৬	০.৬৩	০.৩৯
৪. প্লাস্টিকসামগ্রী	-	৫০.৬৩	-	-	-	-	০.৩১	-
৫. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১৪৭.৯১	২৫৫.১৬	৪২৭	১২৩	৬.২১	৫.৮২	১.৫৮	১.২২
৬. হস্তশিল্প	-	৩.৭৯	১৭	৩০	-	-	০.০২	০.০৫
৭. পাট ও পাটজাত পণ্য	২৯২.৩৭	৭৮৭.৯৯	১০২৬	৯১২	১২.২৭	৯.১৮	৪.৮৬	৩.০৩
৮. টেরি টাওয়েল	১৭.২৬	১৫৭.০৭	-	-	০.৭২	০.৮২	০.৯৭	-
৯. হোম টেক্সটাইল	-	৪০২.৪৯	-	-	-	-	২.৪৮	-
১০. পাদুকা	৯.৫৪	২০৪.০৯	২৪৪	৪৭৯	০.৪০	০.৪৯	১.২৬	০.৭০
১১. সিরামিক সামগ্রী	৫.৬৪	৩০.৭৮	-	-	০.২৪	০.২৪	০.১৯	-
১২. প্রকৌশল দ্রব্যাদি	১৭.৫১	৩১১.০৯	৩৫৬	৫৮৬	০.৭৩	০.২৮	১.৯২	০.৯৩
১৩. ভেসেলস	-	৯.৩৪	-	-	-	-	০.০৬	-
১৪. অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	-	৫৪.৫৭	২৮৬০.২	৪৮৫২	-	-	০.৩৪	৮.০২

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো * জুলাই–ফেব্রুয়ারি

রপ্তানিমুখী শিল্প

২০২২-২৩ অর্থবছরে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার সব মিলিয়ে ৫৫,৫৫৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে।
২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬,৯৯১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল।
উপরিউক্ত তালিকা হতে বোঝা যায়, ১৯৯২-৯৫ হতে বর্তমান সময়েও বাংলাদেশের শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির একক বৃহত্তম খাত হলো তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্প। এ খাত মোট রপ্তানির প্রায় ৮৪.৫৮ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে।

রপ্তানিমুখী শিল্প

রপ্তানিমুখীশিল্পের গুরুত্ব

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশ হতে শুরু করে বর্তমানেও ধনী দেশসমূহ বাংলাদেশের মতো দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশ হতে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করে তা দ্বারা নিজেরা উন্নতমানের শিল্পপণ্য উৎপাদন করে বেশি দামে আবার উন্নয়নশীল দেশে বিক্রয় করে। এর ফলে দরিদ্র দেশগুলোর রপ্তানি আয় স্বল্প কিন্তু আমদানি ব্যয় অধিক হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখীশিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। রপ্তানিমুখীশিল্পের গুরুত্ব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. উৎপাদনে বিশেষায়ন: যে দেশ যে পণ্য উৎপাদনে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা (উৎপাদন খরচ কম) ভোগ করবে সে দেশ সে পণ্য উৎপাদনে বিশেষায়িত হবে। যেমন বাংলাদেশে তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি শিল্পে সস্তা শ্রমিক ব্যবহার হওয়ার কারণে এ পণ্য রপ্তানিমুখীশিল্প হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে।

২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: দেশের চাহিদার অতিরিক্ত রপ্তানিমুখীশিল্প স্থাপনের ফলে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে শ্রমনিবিড় রপ্তানিমুখীশিল্প স্থাপন করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৩. দেশীয় শিল্পের প্রসার: রপ্তানিমুখীশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটে, দেশ শিল্পনির্ভর হয়।

রপ্তানিমুখী শিল্প

রপ্তানিমুখীশিল্পের গুরুত্ব

৪. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার: রপ্তানিমুখীশিল্পের প্রসার ঘটলে একই সাথে দেশীয় শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিবেশে বিদ্যমান অব্যবহৃত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি: দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য এরূপ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে শিল্পপণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা-অভিজ্ঞতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

৬. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: রপ্তানিমুখীশিল্পের প্রসারের ফলে আমদানি হ্রাস পায়, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এটি একটি নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন।

৭. কৃষকবান্ধব কৌশল: দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সস্তায় বিদেশে কাঁচামাল হিসেবে বিক্রি না করে দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বেশি দামে বিক্রি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে কৃষকের আয়ও বৃদ্ধি পায়।

৮. কৃষি আধুনিকায়ন: দেশে শিল্পায়নের ফলে কাঁচামাল হিসেবে কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ তথা আধুনিকায়ন ঘটে। এর ফলে শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি উন্নয়নও সাধিত হয়।

৯. মূলধনী দ্রব্য আমদানি রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের ফলে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেলে তা দ্বারা ধীরে ধীরে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে দেশে শিল্পায়নের গতি আরও প্রসারিত এবং মজবুত করা যায়।

রপ্তানিমুখী শিল্প

রপ্তানিমুখীশিল্পের গুরুত্ব

১০. বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ: রপ্তানিমুখীশিল্পে দেশ সমৃদ্ধ হলে নিট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সহজ হয়।

১১. মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: রপ্তানিমুখীশিল্পে সমৃদ্ধ দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি হয়, তারা প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ভোগ করতে পারে, প্রয়োজনে বিদেশ হতে আমদানিও করতে পারে। এর ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

১২. দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি: রপ্তানিমুখীশিল্পে সমৃদ্ধ দেশ এবং উক্ত দেশের জনগণের মর্যাদা অপরাপর দেশসমূহের নিকট বৃদ্ধি পায়। যেমন-জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানি, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের সুনাম ও মর্যাদা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০৫ রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

ভূমিকা: পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ও পরিবেশবান্ধব ফসল। ১৯৫১ সাল পরবর্তী সময়ে এদেশে পাটশিল্প গড়ে ওঠে। ৫০ ও ৬০ এর দশক হতে স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বৃহত্তর অংশ যোগান দিয়েছে এ পাট খাত। এ কারণে তখন পাটকে 'সোনালী আঁশ' বলা হতো। পূর্বে পাট উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম হলেও বর্তমানে দ্বিতীয় (ভারত প্রথম) কিন্তু পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রথম (মোট বিশ্ববাজারের প্রায় ৬৫ শতাংশ)। এদেশের প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৯০ লক্ষ বেল (১ বেল = প্রায় ৩.৫ মণ) পাট উৎপাদিত হয়। এ দেশের কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ৪৮ ভাগ শ্রমিক পাটশিল্পে নিয়োজিত রয়েছে এবং আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩ ভাগের কম পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

গুরুত্ব: বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্পের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

(i) কর্মসংস্থান: বাংলাদেশে পাটশিল্পখাতে প্রচুর লোক চাষাবাদের কাজে নিয়োজিত হলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের লক্ষ লক্ষ জনবলের জীবিকানির্বাহের সাথে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট।

(ii) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় ৭০ থেকে ৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয় এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৩ ভাগ উপার্জন করে।

(iii) রাজস্ব: বাংলাদেশে পাটশিল্প সরকারি রাজস্বের একটি অন্যতম উৎস।

(iv) শিল্পের কাঁচামাল: পাট থেকে উৎপাদিত সুতা, চট দ্বারা উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, কাপড়, জিওজুট, থলে, নার্সারি পট, ফাইল কভার, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পাটকাঠি-পারটেক্স বোর্ড তৈরি, বেড়া, জ্বালানি, পানের

বরজে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ পাটের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(v) দূষণমুক্ত পরিবেশ: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা এ জাতীয় ব্যাগ, দড়ি পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

পাটজাত দ্রব্য পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। সরকার ও বিদেশি উদ্যোক্তারা যৌথ উদ্যোগে পাটশিল্পের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে ঢাকা শহরে ও মার্চ ২০০২ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সরকার পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে পাটের তৈরি ব্যাগ ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

পাটশিল্প

পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা (Present position of Jute Industry)

দেশ বিভাগ কালে (১৯৪৭) বাংলাদেশের ভাগে একটি পাটকলও পড়েনি, ১৯৫১ সালে এ অঞ্চলে 'আদমজি পাটকল' নামে একটি পাটকলের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬০ সাল নাগাদ দেশে ৮ হাজার তাঁতবিশিষ্ট ১৪টি পাটকল স্থাপিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ৮২টি পাটকল নিয়ে বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিল কারখানার সংখ্যা মোট ২৬টি, তবে চালু আছে ২৫টি। বিজেএমএ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১৬৫টি এবং বিজেএসএ এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলের সংখ্যা ৯৪টি। বর্তমান সরকারের কলকারখানা চালুকরণ নীতির আওতায় বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পিপলস জুট মিলস লি: ও কওমী জুট মিলস লি: কে ২০১১ সালে যথাক্রমে খালিশপুর জুট মিলস লি: এবং জাতীয় জুট মিলস লি: নামে চালু করা হয়েছে।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারি পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। কাঁচা পাট ভিন্ন অন্য যেসব দ্রব্য এর দ্বারা উৎপাদন করা হয় তার মধ্যে চট, দড়ি, থলে, ত্রিপল, কার্পেট, পর্দার কাপড়, জায়নামায, গালিচা, সেলুলয়েড প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো সিরিয়া, সুদান ও তুরস্কে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।" দেশে রপ্তানি আয়ে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে পাটশিল্প।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

পাটজাত পণ্যসমূহ হতে রপ্তানি আয় ছকের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো :

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	১৯৯৯/০০	২০০২/০৩	২০১০/১১	২০১৩-১৪	২০১৬-১৭
পাটজাত দ্রব্য	২৬৬	২৫৭	৭৫৮	৬৯৯	৭৯৫

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৮।

২০২০–২২ অর্থবছরের পাট পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান :

সাল	কাঁচা পাট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	পাটজাত পণ্য (মেট্রিক টন)	পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০২০–২১	৮৪.১৩	৮.৩৭	১১৬১.০০
২০২২–২৩	৮৪.১৪	৮.২৭	৯১২*

সূত্র : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪, ২০২৩–২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে ৯৮.০৫ লক্ষ বেল কাঁচাপাট এবং ৬.২৯ লক্ষ মে. টন পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

পাটশিল্প

পাটশিল্পের সমস্যা

Problems of Jute Industry

বাংলাদেশের পাটশিল্প বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। নিম্নে পাটশিল্পের সমস্যাবলি তুলে ধরা হলো:

১. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি: বাংলাদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনে উৎপাদন খরচ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মূল্য তেমন বৃদ্ধি পায়নি। এর ফলে পাট চাষিদের হতাশাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. উৎপাদন ও বণ্টন সমস্যা: পাট চাষিদের পাট বিপণন ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানা রকম জটিলতা এবং সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া তাদের একদিকে আর্থিক সমস্যা এবং অন্যদিকে সংরক্ষণের সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে পাট উৎপাদনকারী কৃষকের এক বৃহৎ অংশ উৎপাদনের পর-পরই কম মূল্যে পাট বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

৩. পাটের মূল্য সমস্যা: পাটের গুণগত মান, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদার উত্থান-পতন এবং উৎপাদন ও এর বণ্টনের অনিশ্চয়তার জন্য পাটের মূল্যে অত্যধিক উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চালের (ভাত) ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাট চাষিরা পাট উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

পাটশিল্প

৪. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের পাটকলসমূহের ব্যবস্থাপনা প্রায় অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রয়োজনীয় আধুনিকায়নে যন্ত্রাংশের অভাব, বিদ্যুৎ সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি।

৫. মূলধন ও উদ্যোক্তার অভাব: পরিবেশবান্ধব হিসেবে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বৃহদায়তনশিল্প হিসেবে পাটশিল্পে ঝুঁকি গ্রহণ করে শিল্পোৎপাদনে পর্যাপ্ত মূলধন যোগান দেয়ার মতো উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।

পাটশিল্প

৬. পণ্য বহুমুখীকরণ : নাইলন ও প্লাস্টিকসামগ্রীর বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু পাট পরিবেশবান্ধব হলেও পাট ও পাটজাত পণ্য বহুমুখীকরণে (Diversification) সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যথেষ্ট উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

৭. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি: এ দেশের পাটের প্রাথমিক, মধ্যবর্তী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বাজারগুলোতে বেপারি, ফড়িয়া, দালাল, আড়তদার, রপ্তানিকারক ইত্যাদি ধরনের বহুসংখ্যক মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব রয়েছে।

৮. মান নির্ধারণের সমস্যা: বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার পাট বিভিন্ন ধরনের। একই এলাকার বিভিন্ন কৃষকের পাটের গুণগত মানেও পার্থক্য রয়েছে।

৯. বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পাটের বিকল্প হিসেবে কেনাফ, মেশতা, সিনথেটিক্, সিসাল, রোজেল ইত্যাদি উদ্ভাবন হওয়ার ফলে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বর্তমানে জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

১০. মজুতকরণের সমস্যা: বাংলাদেশে পাটের প্রাথমিক বাজারগুলোতে পাট সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদামঘরের অভাব রয়েছে।

পাটশিল্প

১১. অনুন্নত পরিবহণ ও যাতায়াতব্যবস্থা: অনুন্নত পরিবহণ ও যাতায়াতব্যবস্থা বাংলাদেশে পাট বিপণনের জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

১২. বাজার তথ্য সরবরাহের সমস্যা: পাটের বাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে সরবরাহের তেমন কোনো উন্নতব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই।

১৩. বিভিন্ন দেশে পাট উৎপাদন: বর্তমানে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পাটের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। কারণ ভারত, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ব্রাজিল, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশেও উন্নত মানের প্রচুর পাট উৎপাদন হচ্ছে।

১৪. আধুনিক উৎপাদন কাঠামো: বিশ্বায়নের এ সময়ে আধুনিক সুনিপুণ উৎপাদন কাঠামো পাটশিল্পকে দৃষ্টিনন্দনভাবে উপস্থাপন করতে পারে যার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। তাহলে এ সকল পণ্যের যোগান বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ করা যাবে।

১৫. প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত: কৃষিজাতপণ্য রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত প্রায়ই প্রতিকূল থাকে। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে বাংলাদেশ ন্যায্যমূল্য পায় না। উপরিউক্ত কারণে বাংলাদেশে পাটশিল্প মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

পাটশিল্প

পাটশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়

Measures for Solving Problems of Jute Industry

পাটশিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের গুরুত্ব প্রচার করতে হবে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ২০০৯ সাল 'আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ' হিসেবে উদযাপিত হয়েছে।

২. পাটের ভালো ফলনের জন্য উন্নত বীজ সরবরাহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৩. পাটের সর্বনিম্ন ন্যায্য দাম নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষকরা যাতে লাভবান হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

৪. পাট চাষিদের সময়মতো সহজশর্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণদান করতে হবে এবং উৎপাদন খরচ কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. দেশে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের গুণগতমান উন্নত করতে হবে এবং উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে।

পাটশিল্প

৬. পাট উৎপাদনের নানারূপ প্রয়োজনীয় তথ্য রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে কৃষককে জানাতে হবে। এছাড়া, উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পাটকলগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হবে।

৭. দেশের অভ্যন্তরে উন্নতমানের কাঁচাপাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮. পাট চাষিদের নিকট থেকে ন্যায্য ও নির্ধারিত মূল্যে পাট ক্রয় করার জন্য পাট উৎপাদনকারী এলাকাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৯. পাট ব্যবসায়ে নিয়োজিত দালাল, ফড়িয়া, বেপারি ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে হবে।

১০. পাট ও পাটজাত পণ্যের জন্য স্বতন্ত্র রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা গড়ে তোলা আবশ্যক। বিশ্বব্যাপী পাটের রপ্তানি বাড়াতে এটি সাহায্য করবে।

১১. পাটকলগুলোতে উৎপাদন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

পাটশিল্প

১২. পাটকলগুলোতে শ্রমিক সংগঠনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ও অসন্তোষ দূর করা প্রয়োজন।
১৩. বিশ্ববাজারে পুরাতন বাজার ধরে রাখার জন্য উন্নত বাজারজাতকরণ কৌশল অবলম্বন করা উচিত এবং নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো প্রয়োজন।
১৪. পাটশিল্পের মতো বৃহদায়তনশিল্পের বিকাশে সরকারি-বেসরকারি (PPP) যৌথ উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের নীতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
১৫. পাটশিল্পে সরকারকে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিতে হবে।
১৬. পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনে বৈচিত্র্যায়ন করা আবশ্যক।
এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের পাটশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আশা করা যায়।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

ইতোমধ্যে BJMC সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী অব্যবহৃত জমিতে এ প্রাকৃতিক তন্তু দ্বারা বৈচিত্র্যময় পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ২১ জেলায় পাটশিল্প পল্লি প্রতিষ্ঠা করছে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তথ্য পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্য :*

BJMC ২৫টি রাষ্ট্রীয় মিল পরিচালনা করছে। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে ৫৪টি পাটকল বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪টি পাটকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে যারা শর্ত ভঙ্গ করেছে, সেগুলো সরকারের নিকটে এনে পাটপল্লি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	১৬টি জেলায় সর্বাধিক পাট চাষ হয়। প্রতিটাতে ২ লক্ষ বেল এর অধিক পাট উৎপাদন হয়েছে।	সর্বাধিক পাট উৎপাদন হয় ফরিদপুর জেলায়, পর্যায়ক্রমে রাজবাড়ি, মাগুরা, জামালপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, মাদারীপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ।	দেশে বার্ষিক (মোট উৎপাদন প্রায় ৯০ লক্ষ বেল)	বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ এবং বাংলাদেশে তৈরি পোশাক এবং চামড়ার পর ৩য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী খাত।	এ শিল্পে প্রায় দু লক্ষ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে কর্মে নিয়োজিত।

পাটশিল্প

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা**

Future Prospect

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপরিশোধিত বর্জ্য (কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্য) পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের প্রতি পুনরায় বিশ্ব সমাজের আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ২০১৭ সালে ইউরোপের বাজারে পলিথিনের ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এ মহাদেশের ২৮টি দেশে একযোগে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বে প্রতি বছর ৫০০ বিলিয়ন পিস শপিং ব্যাগের চাহিদা আছে। এ বাজারের ২ শতাংশ যদি আমরা ধরতে পারি, তাহলে দেশের পাট খাতের চেহারা বদলে যাবে।*। বাংলাদেশে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সেবামূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইতোমধ্যে এর প্রচেষ্টায় ২৫টি মাঝারিশিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৪০০টি কুটিরশিল্প স্থাপিত হয়েছে। *2 বাংলাদেশে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

পাটশিল্প

(i) পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃত্রিম তন্তুর তুলনায় পাটের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

(ii) মানুষ পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। 'পাটজাত দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়'- এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছে।

(iii) পাটশিল্পে আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের ফলে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

(iv) সবুজ পাট হতে যে কাগজ ও রেয়ন তৈরির মণ্ড উদ্ভাবন করা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

পাটশিল্প

(v) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে এ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করা হলে এদেশে পাটশিল্পের অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পাটশিল্পের অবস্থা ও উন্নতি নৈরাশ্যজনক হলেও নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।. পাটশিল্পের বিভিন্ন উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের কৃষি উন্নয়নের প্রেক্ষিত বদলে যাবে, শিল্পক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়। বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাট ও পাটশিল্পকে প্রতিযোগী করে তোলা এবং পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত 'শিল্পনীতি-২০১০' এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে 'পাটনীতি-২০১১' গৃহীত হয়েছে।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

বস্ত্রশিল্প

ভূমিকা: জীবনধারণের জন্য খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প বস্ত্র হলেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে বর্তমানে প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নিট ও ওভেন পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ২৫-৩০ শতাংশ পূরণে সক্ষম হচ্ছে। এ শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ থেকে ৮৬ শতাংশ বস্ত্র পণ্য ও তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে মোট ৪৬.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ। তাই বলা যায়, বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র: বা. অর্থ, সমীক্ষা ২০২৪

বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের জন্য প্রতি বছর কাপড়ের প্রয়োজন ৮০০ কোটি মিটার। ২০১৪ থেকে ২০১৮, এ পাঁচ বছরে দেশীয় বিনিয়োগ ৬,৯০০ কোটি টাকা, প্রতি বছর গড় বিনিয়োগ ১,৩৮০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে বর্তমানে মিল সংখ্যা: স্পিনিং ৪৩০; ওভেন কাপড় ৮০২; ডেনিম ৩২; হোম টেক্সটাইল ২২; ডায়িং-প্রিন্টিং ২৪৪।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

বস্ত্রশিল্প

২০১৮ সালে তুলা, কাপড় ও সুতা আমদানির চিত্র :

ক. তুলা: পরিমাণ ১৬৯ কোটি ৭৭ লাখ কেজি; মূল্য: ২৯ হাজার ৩০ কোটি টাকা

খ. সূতি সুতা: পরিমাণ ৩৮ কোটি কেজি; মূল্য: ১১ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা

গ. নিট কাপড়: পরিমাণ ১৮ কোটি ৬০ লাখ কেজি; মূল্য: ৯ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা

ঘ. পলিয়েস্টার ফাইবার: পরিমাণ ১৪ কোটি ২৫ লাখ কেজি; মূল্য: ১ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা

৬. ওভেন কাপড়: পরিমাণ ৫৫ কোটি ১৩ লাখ কেজি; মূল্য ৩৩ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা

চ. ভিসকোস ফাইবার: পরিমাণ ৫ হাজার ৪৪ কোটি কেজি; মূল্য :

১ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা।

এছাড়া, বাংলাদেশের মোট বয়নশিল্পী হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ৩,০১,৭৫৭ জন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বাধিক, দ্বিতীয় রাজশাহী। তাঁত-এর সংখ্যায় সর্বাধিক চট্টগ্রাম বিভাগ (৫৬.২০%), দ্বিতীয় রাজশাহী বিভাগ (১৬.৮৯%), ৬৪ জেলার মধ্যে বাগেরহাট, ভোলা, লক্ষ্মীপুর আর চাঁদপুরে তাঁত নেই। হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যাও ১৯৯০ সালে ২,১২,৪২১টি থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ১,১৬,০০৬টিতে নেমে আসে। *২

বস্ত্রশিল্প

বস্ত্রশিল্পের সমস্যা (Problems of Textile Industry): বর্তমানে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন। যা নিম্নরূপ :

(i) বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব অর্থাৎ, তুলা এবং সুতার অভাব।

(ii) বাংলাদেশে উৎপাদিত তুলা ও আমদানিকৃত তুলা উভয়ের মান নিম্ন।

(iii) দেশে পর্যাপ্ত সুতা কলের অভাবের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা উৎপাদিত হয় না।

(iv) বাংলাদেশে বস্ত্র ও সুতার দাম নির্ধারণ এবং বিপণনব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ।

(v) দক্ষ শ্রমিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের বস্ত্রকলগুলোর উৎপাদনক্ষমতা খুবই কম।

(vi) আমাদের বস্ত্রশিল্পের অন্যতম সমস্যা হলো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং মূলধনের অভাব।

(vii) দেশের বস্ত্রকলগুলো অনুন্নত এবং আধুনিক না হওয়ায় বস্ত্রকলে উৎপাদিত কাপড়ের গুণগত মান নিম্ন।

বস্ত্রশিল্প

(viii) বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো প্রয়োজনমত বিদ্যুতের অভাব।
(ix) আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রশিল্পের ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়।
(x) বাংলাদেশের কাপড়ের কলগুলো উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি।
(xi) দক্ষ ও কুশলী শ্রমিকের অভাব এবং প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।
(xii) বস্ত্রশিল্পে পর্যাপ্ত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে বস্ত্রকলগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।
(xiii) মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বিদেশি কাপড়ের সাথে অসম প্রতিযোগিতার ফলে বাংলাদেশের বস্ত্রকলগুলো হুমকির সম্মুখীন।
(xiv) বস্ত্রশিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পসমূহ (তুলা, সুতা ও অন্যান্য) বাংলাদেশে পর্যাপ্ত স্থাপিত হয়নি।
এছাড়াও, প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাব, কারখানার কাজের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর, রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, চাঁদাবাজি এবং পণ্য জাহাজীকরণে প্রায়ই বিলম্ব ইত্যাদি কারণেও বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের কাঙ্ক্ষিত প্রসার ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

বস্ত্রশিল্প

বস্ত্রশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় (Measures for solving Problems of Textile Industry): বাংলাদেশে বস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা যায়:

(i) দেশে উন্নতমানের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

(ii) তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশ থেকেও উন্নতমানের তুলা আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বস্ত্রকলের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(iv) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরও অধিক সংখ্যক সুতাকল ও কাপড় কল স্থাপন করতে হবে।

(v) রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রকলগুলোর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে।

(vi) বস্ত্রশিল্পের জন্য সহজশর্তে ও কম সুদে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(vii) প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানি, বিদ্যুৎ ঘাটতি দূরীকরণ, শ্রম অসন্তোষ দূরীকরণ এবং প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে বস্ত্রকলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

(viii) বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের জন্য বস্ত্রকলগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ix) দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের মান উন্নত করতে হবে।

বস্ত্রশিল্প

(x) বস্ত্রশিল্পকে অসম প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রেখে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।
(xi) বেসরকারি খাতে বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন।
(xii) উৎপাদিত সুতা ও বস্ত্রের দাম নির্ধারণ এবং বিপণনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত, উন্নত করতে হবে।
(xiii) বস্ত্রশিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পসমূহ (Backward Linkage) বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থাপন করতে হবে।
(xiv) বাংলাদেশে পোশাকশিল্প সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। এ খ্যাতি ধরে রাখতে হলে শিল্পনীতিতে বস্ত্র ও পোশাক খাতে বিশেষ নীতি ও কৌশল গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
এছাড়াও, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, বিশ্বব্যাপী নতুন বাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ, বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ডিং তৈরি করা, উন্নয়নমনস্ক জাতি গঠন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতির মাধ্যমে বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

বস্ত্রশিল্প

বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospect of Textile Industry): বাংলাদেশ যদিও বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তারপরও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ-

(i) বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র, যা তুলা চাষের জন্য উপযোগী।

(ii) বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এ থেকে বোঝা যায়, অভ্যন্তরীণ বাজারে বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

(iii) তুলনামূলক স্বল্প মজুরিতে পর্যাপ্ত শ্রমিক সরবরাহ, সুষ্ঠু পরিবহণব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বাজার এবং শক্তি সম্পদের উন্নতির ফলে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল একথা বলা যায়।

(iv) বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের সহায়ক।

(v) বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি খাতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তা বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

(vi) ঢাকার মিরপুরে বেনারসি তাঁতিদের বেসরকারি খাতে তাঁত বস্ত্র তৈরি ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে তাঁত পরিবারসমূহকে ৯০৬টি প্লট প্রদান করা হয়।

(vii) বেসরকারি খাতে তাঁত বস্ত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

বস্ত্রশিল্প

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণে 'টেক্সটাইল পল্লি' স্থাপন; 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ' (PPP) এর আওতায় আধুনিক মেশিনারি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বন্ধ মিলকে পুনরায় চালুকরণ ও সংস্থাকে লাভবান করার পদক্ষেপ গ্রহণ, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়সহ 'বস্ত্র দপ্তর' কর্তৃক পরিচালিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ ও বস্ত্রবিষয়ক দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ, বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের মাধ্যমে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বস্ত্রশিল্পে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ হবে বলে আশা করা যায়।

চা শিল্প

ভূমিকা: চাশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম চা উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের ৩ শতাংশ চা উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। চা-শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজার। তবে সরকারি ও বেসরকারি মিলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এ শিল্পের মাধ্যমে। ৭৫ শতাংশই নারী শ্রমিক। বর্তমানে দেশে মোট ১৬৮টি চা বাগান আছে (সর্বশেষ খাগড়াছড়ি জেলায়)। চা উৎপাদনে শীর্ষে রয়েছে চীন, দ্বিতীয় অবস্থানে ভারত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসেবে, বিশ্বে ৪৭টি দেশে চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে চা চাষের নতুন এলাকা হলো-পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর। বৃহত্তর সিলেটেই ১৩৫টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে মৌলভীবাজারে ৯১টি, হবিগঞ্জে ২৫টি, সিলেটে ১৯টি, চট্টগ্রামে ২২টি, পঞ্চগড়ে ৭টি, রাঙামাটিতে ২টি, খাগড়াছড়িতে ১টি ও ঠাকুরগাঁওয়ে ১টি চা-বাগান রয়েছে। বান্দরবানের রুমায় চা চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

চা শিল্প

পূর্বে চা রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হলেও বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ও ভোগ বেড়েছে, রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চট্টগ্রাম ক্লাব ও আশেপাশের পাহাড়ি এলাকার 'পাইওনিয়ার' বাগানে চা এর আবাদ শুরু হয় এবং ১৮৪৩ সালে চা গাছের পাতা থেকে চা তৈরি হয়। বাণিজ্যিকভাবে ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনিছড়া চা বাগান শুরু হলেও বর্তমানে আমাদের দেশের বৃহত্তর সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চল শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং পঞ্চগড় ও চট্টগ্রামের কিছু কিছু এলাকা চা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী হওয়ার সীমিত আকারে চা চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে চায়ের এ পর্যন্ত ২৩টি ক্লোন উদ্ভাবন করেছে। গত দশ বছরে চায়ের উৎপাদন প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে চা বিক্রির নিলাম কেন্দ্র চট্টগ্রামের সাথে দ্বিতীয় নিলাম কেন্দ্র হিসেবে চায়ের রাজধানী হিসেবে পরিচিত মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম ও শ্রীমঙ্গলের পর দেশের সর্বউত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়েছে।

চা শিল্প

উৎপাদন ও রপ্তানি: চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালে দেশে চা চাষের এলাকা ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬৪২ একর। ২০২০ সালে চা চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার একর। উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বাড়ায় আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছিল চা-শিল্প। চাহিদা মেটাতে ২০১০ সাল থেকে নিয়মিতভাবে আমদানি শুরু হয়। চা উৎপাদনের অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে ২০২৩ সালে দেশের ১৬৮টি চা বাগান এবং ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান থেকে রেকর্ড পরিমাণ মোট ১০.২৯ কোটি কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। চা বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ১৪ কোটি কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উৎপাদন বাড়ার কারণে আমদানিও কার্যত কমে গেছে। শুধু প্যাকেটজাত কোম্পানিগুলো চায়ের স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে সামান্য পরিমাণ আমদানি করছে।

বাংলাদেশের চা আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশেই রপ্তানি হয় এবং এ সকল দেশে খুব জনপ্রিয় চা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। চা-এর অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উৎপাদন বাড়লেও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে চা পানে বাংলাদেশ দশম স্থানে অবস্থান করছে। ২০১৫ সালে ৭৮ হাজার টন চা পান করেছে বাংলাদেশিরা। ২০২০ সালে ৮৬.৩৯ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয় এবং ২২টি দেশে রেকর্ড ২.১৭ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি হয়। (কালের কণ্ঠ, ৪ জুন, ২০২১)।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

চা শিল্প

চাশিল্প থেকে রপ্তানি আয় ছকের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো :

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সাল	২০০৪–০৫	২০০৮–০৯	২০১১–১২	২০১২–১৩	২০১৩–১৪	২০২৩–২৪*
রপ্তানি আয়	১৬	১২	৩	২	৪	৩

সূত্র : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪। * সাময়িক

চা শিল্প

চাশিল্পের সমস্যা /Problems of Tea Industry

বাংলাদেশের চাশিল্পের নিম্নোক্ত সমস্যা রয়েছে:

১. অনিয়মিত বৃষ্টিপাত : চা-এর উৎপাদন একান্তভাবেই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। যে সমস্ত অঞ্চলে বছরে ২০০ থেকে ২২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় অথচ পানি জমে থাকে না, সেরূপ অঞ্চল চা চাষের জন্য উপযোগী। অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে চা-এর উৎপাদন অনেক সময় ব্যাহত হয়।

২. শ্রমিকের অভাব: এদেশে চাশিল্পে কাজ করার মতো দক্ষ শ্রমিক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

৩. সংরক্ষণের সমস্যা: বাংলাদেশে চা গুদামজাতকরণ ও প্যাকেটিং করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির অভাব থাকায় সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়।

৪. যোগান সংকট: চা-এর বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উন্নত জাতের চা উদ্ভাবন করা হয়নি। ফলে চা-এর যোগান সংকট অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

৫. চাষের জমির স্বল্পতা: চা চাষের জন্য যেরূপ ঢালু পাহাড়ি জমির প্রয়োজন তা বাংলাদেশে স্বল্প পরিমাণে রয়েছে।

চা শিল্প

৬. মূলধনের অভাব: বাংলাদেশে চাশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান।

৭. আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব: বাংলাদেশের চাশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

৮. পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের সমস্যা: চাশিল্পের প্রসারের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন হতে শুরু করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্বল্পতাও রয়েছে।

৯. অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা: উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে আমাদের চাশিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. প্যাকিং ও গুদামজাতকরণের সমস্যা: বাংলাদেশের উৎপাদিত চা প্যাকিং ও গুদামজাতকরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় চা উৎপাদন ব্যাহত হয়।

১১. বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস: বাংলাদেশে চা উৎপাদন হয় বেশিরভাগ পাহাড়ি অঞ্চলে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসভূমি ও চাষের জমির কারণে বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। ফলে চা উৎপাদনও হুমকির মুখে পড়ছে।

১২. কীটনাশক ওষুধের অভাব: প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক ওষুধের অভাবে চা উৎপাদন ব্যাহত হয়।

চা শিল্প

১৩. অনিশ্চিত চাহিদা: রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতের দার্জিলিং-এর চা উৎপাদনকারীদের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। কারণ দার্জিলিং চা-এর এক বিশেষ ধরনের গন্ধ (flavour) আছে, যা আমাদের চা-এ নেই। এজন্য বাংলাদেশের চা-এর চাহিদা অনিশ্চিত।

১৪. শ্রমিকের নিম্ন জীবনমান: চা শ্রমিকদের জীবনমান আকর্ষণীয় নয়। তারা অত্যন্ত স্বল্প বেতনে মানবেতর জীবনযাপন করে। তাদের সন্তানদের পড়ালেখা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য সৃষ্টি হয় না। তাই এ পেশায় শ্রমিকরা প্রবেশ করতে চায় না।

১৫. পরিবর্তক দ্রব্যের উপস্থিতি: চা-এর পরিবর্তক দ্রব্য 'কফি'র চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কফির যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দাম হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কফির সাথে চা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে ওঠেছে।

১৬. দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব: বাংলাদেশের চাশিল্পে দক্ষ ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৭. জলবায়ু পরিবর্তন: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে চা চাষের উপযোগী পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে।

চা শিল্প

চাশিল্পের সমস্যার সমাধান

Measures for Solving problems of Tea Industry

বাংলাদেশের চাশিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায়:

১. উন্নত সেচব্যবস্থা : অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে চায়ের উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য পানি সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

২. একরপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি: বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে চা চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে চায়ের দাম হ্রাস পাবে।

৩.মূলধনের সরবরাহ: চায়ের উৎপাদন বাড়াতে এবং চাশিল্পের সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার বাগানে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য উন্নত বীজ ও সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

চা শিল্প

৫. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি: বাংলাদেশি শ্রমিকদের চা বাগানে কাজ করার কোনোরূপ অভিজ্ঞতা নেই, দক্ষতা নেই। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. গুণগত মান বৃদ্ধি: এ দেশের চায়ের গুণগত মান ভারতের দার্জিলিং-এর চায়ের গুণগত মানের সমতুল্য নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিং চা-এর চাহিদা বেশি। তাই আমাদের দেশে উৎপাদিত চা-এর গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। নতুন নতুন জায়গায় উন্নতমানের চা অধিক পরিমাণে উৎপাদনের লক্ষ্যে শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত 'বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট' (BTRI) ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চা শিল্প

৭. উন্নত প্যাকিং ও গুদামজাতকরণ: আকর্ষণীয় প্যাকিং যেকোনো জিনিসেরই গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে চা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা: চাশিল্পের উন্নয়নের জন্য শিল্পাঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

৯. বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ: বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। বরং চা চাষের উপযোগী পরিবেশের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা বা রচনার প্রচেষ্টা গ্রহণ জরুরি।

১০. বেতন কাঠামো : শ্রমিকদের বেতন কাঠামো আকর্ষণীয়, প্রতিযোগিতামূলক করা হলে চাশিল্পে শ্রমিক সংকট সৃষ্টি হবে না। শ্রমিকদের আর্থিক সামর্থ্য ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

চা শিল্প

১১. সুষ্ঠু চা নীতি প্রণয়ন: সুষ্ঠু চা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পূর্বে রপ্তানিকারকদের সুবিধার জন্য চা নিলামকেন্দ্র একমাত্র চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চা নিলামকেন্দ্র মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দ্বিতীয়টি স্থাপন করা হয়। এর ফলে এ অঞ্চলের বাগান মালিকদের নিলামের জন্য চট্টগ্রামে চা পাতা পাঠানোর দরকার পড়বে না।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা হলে চাশিল্পের বর্তমান সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে এবং চাশিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

চামড়াশিল্প

ভূমিকা: ১৯৯০ সালে প্রথমবারের মতো দৈনিক ১০০০ জোড়া উৎপাদনক্ষমতার চামড়ার জুতার একটি ফ্যাক্টরি থেকে বাংলাদেশে এ শিল্পের সূচনা হয়। চামড়াশিল্প বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চামড়াশিল্প পঞ্চম স্থানের অধিকারী। তাই এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চামড়াশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

চামড়াশিল্পের বর্তমান অবস্থা: বিশ্বে চামড়াজাত পণ্য, অর্থাৎ জুতা, স্যান্ডেল, ব্যাগ ইত্যাদির বাজারের আকার প্রায় ২২ হাজার কোটি ডলারের। ২০২১ সালে এর আকার দাঁড়ায় ২৭ হাজার ১২১ কোটি ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ০.৪৬ শতাংশ। চামড়াজাত জুতা রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১৬তম। বাংলাদেশে বর্তমানে দু শতাধিক ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৬০টির অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান হলো অত্যন্ত আধুনিক। এর মধ্যে ৫৪টি নিয়ে বাংলাদেশ ফিনিশড এন্ড লেদার গুডস এক্সপোর্টস এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। এ শিল্পে ৪১ হাজারের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ৪৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৪৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ইপিবির তথ্যমতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ১৬ শতাংশ বাজারের পতন হয়েছে।

চামড়াশিল্প

কাঁচামাল: আমাদের দেশে সারা বছর নিয়মিতভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু জবাই করা হয়। তাছাড়া কোরবানির সময় কমপক্ষে ২০-২৫ লক্ষ গরু ও মহিষ এবং ৪০-৪৫ লক্ষ ছাগল ভেড়া জবাই করা হয়। ফলে বাংলাদেশে পশু চামড়ার যোগান পর্যাপ্ত।

উৎপাদন: বছরে প্রায় ২২ কোটি বর্গফুট চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্বারা-জুতা, চপ্পল, ব্রিফকেস, হাতব্যাগ, ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, ভ্রমণ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, মানি ব্যাগ, ফটোর ফ্রেম, চামড়ার তৈরি গদি, অলঙ্কারের বাক্স, হাত ঘড়ির ফিতা, বেল্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন : মিলিয়ন বর্গমিটার

২০০৪–০৫	২০০৬–০৭	২০০৯–১০	২০১০–১১	২০১১–১২	২০১২–১৩
১৬.৩৩	৬.৬২	১০.৪৫	১০.৬৫	১০.১৪	১৯.০২

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০১৪

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

চামড়াশিল্প

রপ্তানিকৃত দেশ: বাংলাদেশ যেসব দেশে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-চীন, জাপান, ইতালি, ব্রাজিল, হংকং, নেদারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, তাইওয়ান প্রভৃতি।

বাংলাদেশ থেকে পণ্য কিনছে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড: নাইকি, অ্যাডিডাস, টিম্বারল্যান্ড, সিয়ার্স, স্টিভ ম্যাডেন, হুগো বস, মেসি'জ, ডায়েচম্যান, এবিসি মার্ট, এইচঅ্যান্ডএম ইত্যাদি।

রপ্তানি আয়: বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বার্ষিক মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪ ভাগ উপার্জন করে। বর্তমানে এ খাত হতে প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার এর অধিক বার্ষিক আয় হয়।

চামড়াশিল্প

চামড়াশিল্পের সমস্যা

Problems of Leather Industry

বাংলাদেশে চামড়াশিল্প বর্তমানে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। নিচে চামড়াশিল্পের সমস্যাবলি তুলে ধরা হলো :

১. ঋণের অভাব: চামড়াশিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনমতো ঋণ পায় না। যেমন- কোরবানির সময় চামড়া ক্রয় ও গুদামজাত করার জন্য অধিক ঋণের প্রয়োজন হয় কিন্তু তখন পর্যাপ্ত ঋণ পায় না। প্রান্তিক পর্যায়ে যাদের ঋণ খুবই প্রয়োজন, তাদের নিকট ঋণের টাকা পৌঁছানো যায় না।

২. প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা: উন্নত অবকাঠামোর অভাবে ছোট ছোট ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো 'ফিনিশড্ লেদার' তৈরি করতে পারে না।

৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি: বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতির কারণে চামড়াশিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

চামড়াশিল্প

৪. রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব: চামড়াশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায় না। এতে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. দক্ষ জনশক্তির অভাব: চামড়াশিল্প উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে।

৬. ভারতে পাচার: প্রতি বছর চোরা পথে এদেশে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ চামড়া ভারতে পাচার হয়ে থাকে।

৭. সংরক্ষণের অভাব: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য চামড়ার প্রচুর আড়ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে চামড়ার গুদাম প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প।

চামড়াশিল্প

৮. পশু সম্পদ পালনে অনীহা: এদেশে পশু সম্পদ পালন ও উন্নয়নে যথেষ্ট অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

৯. সরকারি উৎসাহের অভাব এদেশে পশু সম্পদ উন্নয়নে সরকারের উৎসাহের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

১০. দর পতন: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চামড়ার উৎপাদন ও বিপণনের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বমন্দার প্রভাব উত্তরণের প্রেক্ষিতেও চামড়ার বাজার অস্থিতিশীল রয়েছে।

১১. পরিবেশ দূষণ: চামড়াশিল্পের জন্য আলাদা কোনো শিল্প নগরী নেই। ফলে এদেশের শহরে, নগরে ও শহরতলীতে এ শিল্প স্থাপন করার ফলে ট্যানারি থেকে নির্গত বর্জ্যে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকার হাজারিবাগের ট্যানারি হতে প্রতিদিন গড়ে ২২ হাজার কিউবিক লিটার বিষাক্ত বর্জ্য নির্গত হয়। এ বর্জ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সালফিউরিক এসিড, ক্রোমিয়াম ও সীসা। এর প্রভাবে উক্ত কারখানার শ্রমিকদের ফুসফুস ও চামড়ার ক্যান্সার, লিভার ও কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত হয়। সরকার এ স্থানে ২০১৬ সাল হতে চামড়াশিল্প কারখানা স্থায়িভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে।

১২. সংকীর্ণ বাজার: বাংলাদেশে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার এখনো প্রসার লাভ করেনি। জনগণের আর্থিক সামর্থ্যের বিষয়টিও এর সাথে জড়িত।

চামড়াশিল্প

চামড়াশিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়"

Measures for Solving Problems of Leather Industry

বাংলাদেশের চামড়াশিল্পের পূর্বোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নের ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা যায়:

১. উন্নতমানের কাঁচা চামড়ার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে 'পশু খামার' গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২. চামড়াশিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণের যোগান দিতে হবে।

৩. কর্মরত শ্রমিকসহ সবার জন্য পরিবেশবান্ধব চামড়াশিল্পের প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

৪. চামড়াশিল্পে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫. ছোট ছোট ট্যানারিগুলোর জন্য "ফিনিশিং ফ্যাসিলিটি সেন্টার" চালু করতে হবে। এর ফলে তারা অবকাঠামোগত সুবিধা পাবে।

৬. প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদন করতে হবে।

চামড়াশিল্প

৭. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. এদেশে চামড়াশিল্পে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া প্রয়োজন।

৯. দেশের বাইরে চামড়া পাচার রোধ করতে হবে।

১০. বিদেশের বাজারে এদেশীয় চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১১. পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে লোকালয় হতে দূরে চামড়াশিল্প নগরী স্থাপন করা প্রয়োজন।

১২. অন্যান্য শিল্পের মতো এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু "চামড়া নীতি" প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

চামড়াশিল্প

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: বাংলাদেশের চামড়াশিল্প বর্তমানে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। কারণ-

১. চামড়াশিল্প নগরী স্থাপন: ঢাকা মহানগরীর হাজারিবাগের ট্যানারি শিল্পসমূহকে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সাভার ও কেরানিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২০০ একর আয়তনবিশিষ্ট চামড়াশিল্প নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানকার ২০৫টি প্লট ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্লটগুলোতে বর্তমানে শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে। সেখানে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

২. কাঁচা চামড়ার পর্যাপ্ত সরবরাহ: পশুমাংস বাংলাদেশের জনগণের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। প্রতিদিন এদেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া জবাই করা হয়। এছাড়া কোরবানির সময় প্রচুর গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া কোরবানি করা হয় বলে চামড়াশিল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা চামড়া পেয়ে থাকে।

৩. চামড়ার উন্নতমান: বাংলাদেশের উৎপাদিত পশুর চামড়া গুণগত দিক থেকে অনেক উন্নত।

৪. সস্তা শ্রম: এদেশে সস্তায় প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়।

চামড়াশিল্প

৫. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা: বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের চামড়াশিল্প বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। দেশে মোট চামড়ার ২০-২৫ শতাংশ ব্যবহার করে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ১০০ কোটি ডলার হয়েছে (২০১৬-১৭)। দেশে চামড়ার আরও ৩০ শতাংশ ব্যবহার করে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করতে পারলে ভবিষ্যতে এ খাতে রপ্তানি আয় ৫০০ কোটি ডলার অতিক্রম করানো সম্ভব। বর্তমানে দেশে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

তৈরি পোশাকশিল্প

ভূমিকা: পোশাকশিল্প বাংলাদেশের অতি সম্ভাবনাময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রুত বিকশিত শিল্প। ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়। ১৯৮০ সালে পোশাকশিল্পে সবকার পাঁচ বছরের জন্য ভর্তুকি প্রদানমূলক ঋণ প্রদান করলে ১৯৮৫-৮৬ সাল নাগাদ দেশের আনাচে-কানাচে ছোট বড় অসংখ্য পোশাকশিল্প গড়ে ওঠে। এ শিল্প শ্রমনিবিড় শিল্প। দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী (মোট রপ্তানি আয়ের ৮৬%) শিল্প হিসেবে এ শিল্প বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করছে।

তৈরি পোশাকশিল্প

গুরুত্ব (Importance): বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ উৎস হলো তৈরি পোশাকশিল্প। এ প্রেক্ষিতে তৈরি পোশাকশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

(i) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: বাংলাদেশ জনবহুল ও শ্রমঘন দেশ। এ শিল্পে যেহেতু কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, তাই এটি অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা অনেক গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে বস্ত্র ও পোশাকশিল্পে বর্তমানে প্রায় ৪৪ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত আছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২ কোটির অধিক লোক এর দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে।

সাল	তৈরি পোশাক কারখানা	শ্রমিক (লক্ষ)
১৯৮৫–৮৬	৫৯৪	২
১৯৯৪–৯৫	২১৮২	১২
২০০৫–০৬	৪২২০	২২
২০১৬–১৭	৪৪৮২	৪০

সূত্র : বিজিএমইএ ওয়েবসাইট, অক্টোবর ২০১৭

তৈরি পোশাকশিল্প

(ii) দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি: পোশাকশিল্প প্রথমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে তা সম্প্রসারিত হয় এবং উদ্যোক্তার দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

(iii) আত্মনির্ভরশীল পরিবার: পোশাকশিল্পে কর্মরত প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিকের বেশির ভাগই দরিদ্র মহিলা শ্রমিক। তারা উপার্জিত অর্থ দ্বারা তাদের দরিদ্র পরিবারকে আত্মনির্ভরশীলভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।

(iv) ব্যাংক ও বিমা ব্যবসার প্রসারণ: বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে কেন্দ্র করে ব্যাংক ও বিমা ব্যবসার উন্নয়ন হচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ধনাত্মক ভূমিকা রাখবে।

(v) বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন: দেশে পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে কাপড়ের উৎপাদন প্রায় শতভাগ বেসরকারি খাতেই উৎপাদিত হচ্ছে। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৫০ হতে ৭৪০০ মিলিয়ন মিটার পর্যন্ত যা সম্পূর্ণভাবে যোগান দিয়েছে বেসরকারি খাত। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্প

(vi) পরিবহণ খাতের প্রসারতা: পোশাকশিল্প বিকাশের ফলে পরিবহণ খাতের প্রসার ঘটেছে।

(vii) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি: পোশাকশিল্প বাংলাদেশের সনাতনী রপ্তানি আয়ের খাতগুলোকে পিছনে ফেলে বর্তমানে বৃহৎ উৎসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এদেশের অর্থনীতির জন্য এ খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(viii) ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ: বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের জন্য সুতা, লেবেল, কার্টুন, পলিব্যাগ, গামটেপ, প্যাকিং প্রভৃতি পণ্যের কারখানার দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এর মাধ্যমে সহায়ক পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প বা 'ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ (Backward Linkage) ইন্ডাস্ট্রির' উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

(ix) নারীদের কর্মসংস্থান: সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীশ্রেণির এ শিল্পে কাজ করার সুযোগ থাকায় এ শিল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(x) অন্যান্য খাত: পোশাকশিল্পের উন্নয়নের ফলে সড়ক, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বন্দর, পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটছে। এর ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে।

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

তৈরি পোশাকশিল্প

২০২২ সালে পোশাকশিল্পের বৈশ্বিক বাজারে প্রথম স্থানে চীন, দ্বিতীয় বাংলাদেশ, তৃতীয় ভিয়েতনাম, চতুর্থ তুরস্ক, পঞ্চম ভারত। সূত্র: ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৩ (WTO) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন দেশ কোন পণ্য কত রপ্তানি করছে ডলারের হিসেবে, সেটা প্রকাশ করে দেশটির বাণিজ্য দপ্তরের 'অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলস (অটেক্সা)। সংস্থাটির হিসাবে দেখা যায়, ২০২২ সালে দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক গেছে ৯.৭২ বিলিয়ন ডলার, ২০২৩ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৭.২৯ বিলিয়ন ডলার (২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে)। তবে এ সময়ে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে বাংলাদেশের নন-ট্রাডিশনাল মার্কেটে (জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চীন, তুরস্ক, ব্রাজিল, রাশিয়া, সৌদিআরব প্রভৃতি দেশে) ২০১২-১৩ সালে যেখানে তৈরি পোশাক রপ্তানি ছিল ১৪.৭৯ শতাংশ, পাঁচ বছর পর ২০১৯ সালে ১৬.৬৭ শতাংশ এবং সর্বশেষ ২০২৩ সালে সেটা হয় মোট পোশাক রপ্তানির ১৮.৭২ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মূল্যস্ফীতি, সুদের হারের কারণে ভোগ কমেছে। এছাড়া আরেকটা চ্যালেঞ্জ হলো শুল্ক বাধা। শুল্ক বাধা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে টার্গেটকৃত দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়া। এটা হতে পারে দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি। কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশে এখনো আমরা পিছিয়ে আছি, তবে উক্ত বাজার ধরার জন্য পণ্য বহুমুখীকরণ করতে হবে। আমাদেরকে ইনোভেশনে যেতে হবে। পোশাকের ডিজাইনে ইনোভেশন আনতে হবে।

তৈরি পোশাকশিল্প

পোশাকশিল্পের সমস্যা/Problems of Garments Industry

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্প দ্রুত বিকাশমান এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্প, তথাপিও বর্তমানে নিম্নোক্ত সমস্যার সম্মুখীন:

১. শুল্কবাধা ও প্রতিবন্ধকতা: বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর বিভিন্ন ধনীদেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ইইউভুক্ত দেশসমূহ নানারূপ শুল্ক ও অশুল্ক বাধা আরোপ করছে। জনবহুল উন্নয়নশীল দেশে শুল্ক বাধা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা পোশাকশিল্পের উৎপাদনের গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে।

২. কাঁচামালের অভাব': বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের বড় সমস্যা হলো পর্যাপ্ত পরিমাণের কাঁচামালের অভাব। এছাড়া আমদানিকৃত কাঁচামালও নিম্নমানের। এর ফলে পোশাকশিল্পের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।

৩. দক্ষ শ্রমিকের অভাব এদেশে এ শিল্পে কর্মরত ৮০ শতাংশ শ্রমিকই গ্রাম থেকে আগত অশিক্ষিত 'ও অনভিজ্ঞ মহিলা। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের গুণগত মান অন্যান্য দেশের তুলনায় কম।

৪. অন্যান্য দেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন: বিশ্বের অনেক দেশই বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাণিজ্যের অংশবিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। এভাবে তৈরি পোশাক প্রতিযোগিতামূলকভাবে রপ্তানি করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্প

৫. নিম্নমানের পোশাক: বাংলাদেশে যে পোশাক তৈরি হচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রে বিদেশিদের অর্ডার ও চুক্তিমাফিক হয় না। ফলে আমদানিকারক দেশ তা গ্রহণ করে না, এমনকি ভবিষ্যৎ অর্ডারও মাঝে মাঝে এ কারণে বাতিল হয়ে যায়।

৬. কারিগরি দক্ষতার অভাব: এ দেশের পোশাকশিল্পের কারিগরি দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৭. বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা: এ দেশে বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে পোশাকশিল্পের উৎপাদন ও উন্নয়ন যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৮. রপ্তানি পোশাকের আইটেম কম: বাংলাদেশ শুধুমাত্র ৮ থেকে ১২টি আইটেম তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। কিন্তু ভারত ১৮টি, হংকং ৬৫টি, চীন ৫৬টি, তাইওয়ান ৫৩টি আইটেম-এর তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। আন্তর্জাতিক বাজারে ১১৫-১২০ আইটেমের তৈরি পোশাকের চাহিদা রয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্প

৯. আর্থিক ঋণ সুবিধার অনুপস্থিতি: বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও তার পর্যাপ্ত পরিমাণে অভাব রয়েছে।

১০. কাজের প্রতিকূল পরিবেশ: এ দেশের পোশাকশিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিকদেরকে আলো বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একসঙ্গে গাদাগাদি হয়ে কাজ করতে হয়। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পায় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কারখানার মূল দরজা বন্ধ থাকায় অগ্নিকাণ্ডের সময় অনেক শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যায়। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য স্বীকৃত কর্মসময়ও এখানে প্রায় অনুসরণ করা হয় না।

তৈরি পোশাকশিল্প

পোশাকশিল্পের সমস্যার সমাধান

Measures for Solving problems of Garments Industry

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির একটি বৃহৎ অংশ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পোশাকশিল্পের অবদান আরও বাড়াতে হলে এ শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করতে হবে। পোশাকশিল্পের সমস্যা সমাধান করার জন্য নিম্নের ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্য-ব্যবস্থার সুযোগ আহরণ: আমদানিকারক দেশ বর্তমানে কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্য-ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির ওপর আমদানি শুল্কের হার যাতে নমনীয় করে সে বিষয়ে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন এবং নতুন নতুন আইটেমের পোশাক রপ্তানির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

২. প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ: প্রতিযোগী দেশ কোন্ আইটেম উৎপন্ন করে এবং ঐ পণ্যের মানের প্রতি খেয়াল রেখে এ দেশের পোশাক উৎপন্ন করার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

৩. নতুন বাজার অনুসন্ধান: বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করতে হবে। নতুন বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজার গবেষণা করতে হবে। ইতোমধ্যে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, তুরস্ক, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন বাজার হিসেবে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প স্থান করে নিয়েছে।

৪. কারিগরি উন্নয়ন: পোশাকশিল্পের সমস্যাসমূহ দূরীভূত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে সাথে শিল্পের কারিগরি উন্নতির প্রয়োজন। বিদেশি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার সাথে সাথে এদেশে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. পণ্যের উন্নত মান নির্ধারণ: আন্তর্জাতিক বাজারে যাতে দেশীয় তৈরি পোশাক বেশি পছন্দনীয়, আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময় হয় সেজন্য বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মান উন্নত ও বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় পোশাক উৎপাদন করতে হবে।

ইতোমধ্যে বিশ্বে একক দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় এবং ইউরোপে ২৫ বছর পর ২০১১ সালে শীর্ষে পৌছেছে।

৬. শিল্প শ্রমিক প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের শ্রমিক কম শিক্ষিত ও অদক্ষ। এ অশিক্ষা এবং অদক্ষতা দূরীকরণে প্রাথমিক অবস্থায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৭. পোশাকের আইটেম বৃদ্ধি: বিদেশের বাজারে প্রায় ১২০ রকমের পোশাকের চাহিদা রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ শুধুমাত্র ৮-১২টি আইটেম রপ্তানি করতে পারে। তাই বাংলাদেশের পোশাকের আইটেম বৃদ্ধি করতে পারলে অতিরিক্ত রপ্তানি থেকে জাতীয় আয়ে একটি বৃহত্তর অংশ সংযুক্ত হবে।

৮. দেশীয় কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি: উচ্চ মূল্যে কাঁচামাল আমদানি না করে পোশাক তৈরির জন্য সুতা, তুলা, রং ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান দেশীয়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে কমমূল্যে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়।

৯. কর্মনৈপুণ্যতা বৃদ্ধি: শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করলে তার সাথে তাদের কাজের দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্যতা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিরাপদ ও উন্নত করা, সুস্থ সংগঠন করার অধিকার ও মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশি শ্রমিক বিশ্ববাজারে পোশাকশিল্পখাত হতে সুনাম ও সম্মান বয়ে আনবে।

১০. পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদান: এদেশের পোশাকশিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান অত্যাবশ্যক।

১১. এজেন্টদের দৌরাত্ম্য হ্রাসকরণ: দেশি-বিদেশি মধ্যস্থ কারবারি ও এজেন্টদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এর ফলে উৎপাদনকারিগণ, উপকৃত হবে।

১২. স্বায়ত্তশাসিত ব্যুরো। গঠন: বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বহুমুখী করার লক্ষ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যুরো গঠন করা দরকার।

১৩. বিদেশি উদ্যোক্তাদেরকে সুবিধা প্রদান: বিদেশি উদ্যোক্তাদের দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এর ফলে এদেশের পোশাকশিল্প আরও দ্রুত বিকশিত হবে।

১৪. সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ: এদেশের উৎপাদনকারিগণকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পোশাকশিল্পের বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন।

১৫. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ একই সঙ্গে কাজ করলে রপ্তানির পরিমাণ প্রসারিত হবে।

১৬. রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণ: ইতোমধ্যে চীনসহ কয়েকটি দেশ পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কর মুক্ত বা ব্যাপক হারে কর হ্রাস করেছে। তাই বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকার অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে পারে।

পোশাকশিল্পের সম্ভাবনা

Future Prospect of Garments Industry

পোশাকশিল্প বাংলাদেশের একটি দ্রুত বিকাশমান শিল্প। বর্তমানে আমাদের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ এ খাত থেকে আসে। যদিও রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক নির্ভর। ইপিবি এর তথ্যানুসারে, ২০২৩ এর এপ্রিল-মে মাসে ডলার সংকটের মধ্যে পণ্য রপ্তানি ও প্রবাসী আয়-দু'টোই কমে যায়। এক মাসের ব্যবধানে প্রবাসী আয়ে সুখবর না থাকলেও পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ২৬.৬১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় ৪৬.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা উক্ত সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪.৫৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রপ্তানি হয় ৩২.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একসময় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের সাড়ে ৯২ শতাংশের গন্তব্য ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। প্রচলিত এ বাজারের বাইরে নতুন বাজারের হিস্যা ছিল মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ, যা বেড়ে এখন ১৮.৭২ শতাংশ হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে তৈরি পোশাক শিল্পে নতুন এক রূপান্তরের ঢেউ লেগেছে। প্রআ, পৃ. ১১, ২৯ জানুয়ারি ২০২৪

রপ্তানিমুখীশিল্পঃ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক

বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগান: বাংলাদেশে পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগান বিদ্যমান, যা সস্তায় পাওয়া যায়। পোশাকশিল্প মূলত শ্রমনিবিড় শিল্প। এক্ষেত্রে এদেশে উৎপাদন ব্যয় কম হয়।

২. নারী শ্রমিক: এদেশে পোশাকশিল্পে সস্তায় নারী শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ রয়েছে এবং বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৮০% হলো দরিদ্র নারী শ্রমিক, যাদের গড় মাসিক বেতন ৮০০০ টাকা।

৩. মজুরি স্বল্প: এদেশের শ্রমিকের মজুরি তুলনামূলকভাবে স্বল্প।

৪. ঋণের সহজলভ্যতা: বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে পোশাকশিল্পের জন্য সহজশর্তে ঋণ পাওয়া যায়।

৫. স্বল্প মূলধনে শিল্প স্থাপন: এ শিল্প স্থাপনে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এ কারণে অনেক উদ্যোক্তাই এ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছেন।

৬. অধিক বিনিয়োগ প্রবণতা: এ পোশাকশিল্পে বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং মুনাফা অর্জনের মধ্যে সময় ব্যবধান কম। এ কারণে এ শিল্পের উদ্যোক্তারা অধিক বিনিয়োগে আগ্রহী।

৭. উদার শিল্পনীতি: বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের দ্রুত বিকাশের জন্য সরকার উদার শিল্পনীতি গ্রহণ করেছে।

৮. কর্মপরিবেশ: বর্তমানে বিদেশি ক্রেতাগণ সোস্যাল কমপ্ল্যায়ান্স-এর ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে এবং এর শর্তসমূহ মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করছে। এর ফলে ইপিজেডসহ বিভিন্ন স্থানে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে বেপজাসহ বিভিন্ন ইপিজেডসমূহের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে।

৯. পররাষ্ট্রনীতি: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো, সকলের সাথে বন্ধুত্ব-এ কারণে বাংলাদেশের মিত্র দেশের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাথে সাথে পোশাকশিল্পের বাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসহ অনেক দেশ থেকে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে GSP সুবিধা পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকেও অনুরূপ বা শুল্ক হ্রাস সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১০. এ খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ: বর্তমান সরকার কর্তৃক এ খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো: (i) শ্রমিক শ্রেণির দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, (ii) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ; (iii) পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সহজীকরণ, (iv) বিমা প্রিমিয়াম হ্রাস, (v) নগদ সহায়তা প্রদান, (vi) কমপ্ল্যায়েন্স অনুসরণ, (vii) বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল মওকুফ এবং উৎপাদনের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য, (viii) মালিক, শ্রমিক ও সরকারের পক্ষে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্প।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০৬ আমদানি বিকল্পশিল্প

আমদানি বিকল্পশিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আমদানি বিকল্পশিল্প

পৃথিবীর অপরাপর দেশ হতে আমদানিকৃত পণ্য-দ্রব্য হ্রাস করে উক্ত দ্রব্য উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন, উৎপাদন এবং যোগান দেয়াই হলো আমদানি বিকল্পশিল্প (Import Substitution Industry), আমদানি বিকল্প বলতে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা দেশীয় চাহিদা মেটানো বোঝায়। এরূপ শিল্পায়নের ফলে একটি দেশ তার বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ব্যবধান হ্রাস করে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে পারে। কৃষি, শিল্প এবং সেবা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমদানিবিকল্প ধারণা প্রয়োগ করা যায়। কোনো দেশের জনগণ যখন দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হয়, তখন সেখানে এ নীতি প্রয়োগ করা সহজ হয়।

আমদানি বিকল্পশিল্প

বাংলাদেশের আমদানি বিপল্পশিল্পের গুরুত্ব

বাংলাদেশের মতো জনবহুল, উন্নয়নশীল ও মূলধন স্বল্পতার দেশে প্রতি বছর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খাদ্য সংকট লেগে থাকলে তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির বোঝা বাড়ে।

অবকাঠামো নির্মাণসহ শিল্পোন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিদেশ হতে যন্ত্রাংশসহ কাঁচামাল আমদানিবাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। দেশীয় শিল্পের কাঁচামালের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী, বিলাসজাতীয় দ্রব্য যেমন-স্বর্ণ অলংকার, গাড়ি, কসমেটিক্স প্রসাধনী প্রভৃতি আমদানি করার জন্যও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সে তুলনায় বাংলাদেশি পণ্য বিদেশে তেমন রপ্তানি হয় না। ধনী দেশগুলো আমাদের মতো দেশগুলোকে নানারূপ কঠিন বাণিজ্য শর্তে আবদ্ধ করে রাখে। তাছাড়া অনেকক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় পণ্যের গুণগত মান নিম্ন-দাম বেশি। তাই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ি।

আমদানি বিকল্পশিল্প

বাংলাদেশের আমদানি বিপল্পশিল্পের গুরুত্ব

বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে আমদানি বিকল্পশিল্পের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: বাংলাদেশে কর্মহীন, বেকার জনসংখ্যা প্রচুর। এ তীব্র বেকারত্বের বোঝা লাঘব করার লক্ষ্যে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে আমদানি হ্রাস পাবে, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধিরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(খ) দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ: বিদেশি শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় নবীন শিল্পসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিদেশি শিল্প পণ্য আমদানি বন্ধ বা নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। এজন্য আমদানিকৃত পণ্যের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানো যায়। এর ফলে দেশীয় শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণতায় ফিরে আসবে। দেশীয় শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশীয় নাগরিকদের ব্যবহারের উপযোগী হবে। এভাবে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একসময় দেশীয় শিল্পসমূহ বিদেশি শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বরাজারে টিকে থেকে মুনাফা আহরণ করতে পারবে।

(গ) অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারণ: আমদানি বিকল্পশিল্প দেশে স্থাপিত হলে উক্ত শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের দাম তুলনামূলক কম হবে। পণ্যটির বাজার সমগ্রদেশে বিস্তার লাভ করবে। এভাবে পণ্যের বাজার সম্পর্কিত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর হওয়ার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

আমদানি বিকল্পশিল্প

বাংলাদেশের আমদানি বিপল্পশিল্পের গুরুত্ব

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস: বাংলাদেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ আয় রপ্তানির মাধ্যমে আসে তার চেয়ে বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে প্রতি বছর বাংলাদেশকে বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়। এ অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে একমাত্র পথ হলো আমদানি বিকল্পশিল্প স্থাপন করা।

(ঙ) বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়: আমদানি বিকল্পশিল্প গড়ে ওঠলে দেশের আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে।

(চ) শিল্পায়ন: আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন হলে দেশে প্রচুর শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

(ছ) আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি: দেশে আমদানি বিকল্পশিল্পব্যবস্থা গড়ে ওঠলে, দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে মূলধন বাজার শক্তিশালী হবে, মূলধন দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা দূরীভূত হবে। উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার মাধ্যমে এভাবে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্ব-নির্ভর হবে।

আমদানি বিকল্পশিল্প

বাংলাদেশের আমদানি বিপল্পশিল্পের গুরুত্ব

(জ) দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন: আমদানি বিকল্প শিল্পব্যবস্থা গড়ে ওঠলে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, দেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

এছাড়া, দেশীয় পণ্য ব্যবহার উপযোগী শিল্প স্থাপন করে আমদানি হ্রাস করা যায়। প্রয়োজনে বিদেশি বিলাসজাতীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ বা হ্রাস করে এ খাতেও দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

আমদানি বিপল্প শিল্পায়নের সমস্যা

আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা রয়েছে, যা নীতি নির্ধারকদের বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যেমন:

(i) কৌশল নির্ধারণে সমস্যা: প্রত্যেক দেশপ্রেমিক সরকার তার রাষ্ট্র পরিচালনার সময় এরূপ কৌশল অতীতে গ্রহণ করেছে কি-না, তা বর্তমান সরকারকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ণয় করে নতুন কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আবার যিনি মূল পরিকল্পনাকারী, তিনি দেশীয় না বিদেশি হবে, তাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা তৈরি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমদানি বিকল্পশিল্প স্থাপন জরুরি তা নির্ধারণও একটি জটিল বিষয়।

(ii) অপ্রয়োজনীয় এবং নেশাজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে: অপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন কোকাকোলা, ফান্টা, দামি কসমেটিক্স, বিদেশি সুগন্ধি প্রভৃতি এবং সিগারেটসহ ক্ষতিকর বিভিন্ন নেশাজাতীয় পণ্যের আমদানি বিকল্পশিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে। দরিদ্র জনবহুল দেশে যেখানে মানুষ দু বেলা পেট ভরে খাওয়া এবং মোটা কাপড়, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যা প্রকট, সেখানে এরূপ পণ্যের আমদানি বিকল্পশিল্প স্থাপনের যৌক্তিকতা নির্ণয় জরুরি।

আমদানি বিকল্পশিল্প

আমদানি বিপল্প শিল্পায়নের সমস্যা

(iii) কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত: আমদানিবিকল্প শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশে পুঁজিনির্ভর উৎপাদনব্যবস্থা চালু হয়। এর ফলে শ্রমবহুল দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

(iv) ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত : আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন মূলত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত। এক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার অভাব বা সংরক্ষণ সুবিধা, সংকীর্ণ বাজার ইত্যাদি কারণে দেশীয় ভোক্তারা বেশি দামে তুলনামূলক নিম্নমানের পণ্য-দ্রব্য ভোগ করতে বাধ্য হয়।

আমদানি বিকল্পশিল্প

আমদানি বিপল্প শিল্পায়নের সমস্যা

(v) বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে অবাস্তব ধারণা: বিশ্বায়নের এ সময়ে লক্ষ্য হলো মেধা ও উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি দেশ তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করা। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিশ্ববাজারে প্রবেশের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল একটি অবাস্তব ধারণা।

আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক সুবিধা নীতি অনুসরণ করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) হ্রাস পায়, কিন্তু দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে FDI এর অধিক প্রবাহ প্রয়োজন। উপরিউক্ত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশ আমদানিবিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করে উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে।

একটি উদাহরণ: স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চমূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়।

আমদানি বিপল্প শিল্পায়নের সমস্যা

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৭টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৫৭টি দেশে রপ্তানি করছে। ঔষধ রপ্তানির পরিমাণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে ২৭২টি এলোপ্যাথিক, ২৭১টি ইউনানি, ২০৫টি আয়ুবেদিক, ৭৮টি হোমিওপ্যাথিক এবং ৩২টি হার্বাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি সূচি : (কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে (সংখ্যা)
২০০৯	৩৩৫.২১	৩৪৭.১৭	৭৩
২০২২	৬৬৩৭.৭	৬৬৩৭.৭	১৫৭
২০২৩	–	৮৯০৩.৯৬	১৫৭

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০৬ আমদানি বিকল্পশিল্প

আমদানি বিকল্পশিল্প

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

শিল্পায়নে সরকারি নীতি

শিল্পখাত ও শিল্পোন্নয়ন-এর সাথে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক কীরূপ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে শিল্প কীভাবে সম্পর্কিত-এ সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালাকে শিল্পনীতি বলা হয়।

শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে-কাঁচামালের ধরন, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবস্থানের ধরন ও ভূমিকা; কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপায়, আমদানি বিকল্পন নাকি রপ্তানিমুখীশিল্প; সংরক্ষিত ও উন্মুক্ত শিল্পের তালিকা, শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ভিত্তি, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপায় ও বিশ্বায়নের সুফল লাভ ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে ৮টি শিল্পনীতি প্রণীত হয়েছে। যেমন-

১. শিল্পনীতি-১৯৭৩: মূল বৈশিষ্ট্য-জাতীয়করণ ও আমদানি বিকল্পশিল্পনীতি গ্রহণ। তবে এ নীতি ১৯৭৪ সালে সংশোধিত, ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক, ১৯৭৮ সালে বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপনের সীমা তুলে দেওয়া হয় এবং আর কোনো শিল্প জাতীয়করণ করা হবে না মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন হতে বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং শেয়ার মার্কেট চালু করা হয়।

২. শিল্পনীতি-১৯৮২:

মূল বৈশিষ্ট্য-বেসরকারিকরণ (Privatization), উদারীকরণ (Liberalization) এবং বিশ্বায়ন (Globalization)। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে দ্রুত বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া, বেসরকারি বিনিয়োগে বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া এবং আমদানি নীতি উদারীকরণই হলো এ শিল্পনীতির মূল ভিত্তি।

৩. শিল্পনীতি-১৯৮৬:

মূল বৈশিষ্ট্য-মাত্র ৭টি মৌলিক ও ভারীশিল্প ছাড়া অন্যসকল শিল্পকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত করার জন্য ৪৯% শেয়ার শ্রমিক বা জনগণের মাঝে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। ৪. শিল্পনীতি-১৯৯১ :

মূল বৈশিষ্ট্য-বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ নীতিমালা আরও সহজ, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে যৌথ মালিকানায় স্থানান্তরের মাধ্যমে পরবর্তীতে বেসরকারিকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি শিল্প-কারখানায় সমান সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫. শিল্পনীতি-১৯৯৯ :

মূল বৈশিষ্ট্য-এ শিল্পনীতি ৫ বছর মেয়াদি, GDP তে শিল্পখাতের অবদান ২৫% এ উন্নীতকরণ এবং শিল্পকারখানায় মহিলাদের অধিক নিয়োগের লক্ষ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. শিল্পনীতি-২০০৫:

মূল বৈশিষ্ট্য-পূর্বাপেক্ষা এর আওতা প্রসারিত হয়। অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া, অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা স্থাপন, তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পকে অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা, আমদানি বিকল্পশিল্প স্থাপন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্ব প্রদান, কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপন, বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, শিল্পসংক্রান্ত তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং সংরক্ষিতশিল্পের তালিকা সংক্ষিপ্ত করে মাত্র ৪টি শিল্পকে এখাতে রাখা হয়েছে-তা হলো- (i) প্রতিরক্ষা, (ii) পারমাণবিক শক্তি, (iii) সিকিউরিটি প্রিন্টিং/টাকশাল এবং (iv) বনায়ন।

৭. শিল্পনীতি-২০১০ :

মূল বৈশিষ্ট্য-অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। এজন্য শিল্পায়ন তথা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে যুগোপযোগী শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সরকার শিল্প নীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

(i) উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিয়োগ ২৫% এ উন্নীত করা।

(ii) নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা।

(iii) দারিদ্র্য দূরীকরণ, দারিদ্র্যের হার ৪০% হতে ২৯% নামিয়ে আনা।

(iv) পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(v) পাটের বহুমুখী ব্যবহার ও পাটশিল্পকে লাভজনক করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

(vi) বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে-স্থানীয় শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ।

(vii) যেখানে সুযোগ আছে সেখানে আমদানি-বিকল্পশিল্প স্থাপন এবং অব্যাহতভাবে অধিক মাত্রায় রপ্তানিমুখীশিল্পের উন্নয়ন।

(viii) বাংলাদেশের শিল্পখাতের নিয়ামক হবে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত।

(ix) অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে।

(x) জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ২৮% থেকে ৪০% এ নিয়ে যাওয়া।

(xi) বন্ধ শিল্পগুলোকে সংস্কারের আওতায় এনে পুনরায় চালু করা।

(xii) দেশকে দ্বৈত অর্থনীতির কবল হতে মুক্ত করে শিল্পনির্ভর দেশে রূপান্তর।

(xiii) রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্পকারখানাগুলোকে লাভজনক করা। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ করার ওপর জোর দেয়া হয়।

(xiv) ২০১৭ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১০% এ উন্নীত করা।

(xv) ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

(xvi) ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

৮. শিল্পনীতি-২০১৬:

সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় টেকসই শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ২৯ হতে ৩৫ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং শ্রমশক্তির নিয়োগ ১৮ হতে ২৫-এ উন্নীতকরণ। তথ্য প্রযুক্তির প্রসার এবং নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি। আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশজ উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, পরিবেশ ও ভোক্তাবান্ধব শিল্পের বিকাশ।

শিল্পায়নে সরকারি নীতিঃ সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পায়নে সরকারি নীতি

২০১১-২০১৫ এবং Outline Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021): Making Vision 2021 A Reality এর আলোকে একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণসহ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল উন্নয়নের সমন্বিত কৌশলপত্র, উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থার প্রতিফলনসহ বেসরকারি উদ্যোগ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে বেগবান করার জন্য বেসরকারিখাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালনের অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। শ্রমনীতির আলোকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের বিষয় নিশ্চিতকরণ ও শিল্পখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন ও শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক শিল্প উপখাতসমূহকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান হচ্ছে এ শিল্পনীতির একটি অন্যতম লক্ষ্য।

শিল্পায়নে সরকারি নীতিঃ সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দারিদ্র্যবিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পের (এসএমই) সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণ ও অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে শিল্পখাতের একটি অনুষঙ্গরূপে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ দেশের সহজলভ্য জনসম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিরল সুযোগ (Opportunity) এনে দিয়েছে। এ লক্ষ্যে শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।শিল্পনীতি-২০১০ এ যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তাতে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শিল্পখাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন (Sustainable & continuous industrial growth) সম্ভব হবে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দারিদ্র্যবিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

শিল্পায়নে সরকারি নীতিঃ সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সরকারি নীতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে ৬.৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৮% এ উন্নীত করা। কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের অর্থবহ প্রবৃদ্ধি অর্জন। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান ১৫% থেকে ২০% এ উন্নীত করে, অর্ধবেকার, ছদ্মবেশী বেকারদের জন্য ভালো মানের কর্মসুযোগ সৃষ্টি।

২০২০ সালের মধ্যে সেবাখাতের অবদান জিডিপি-এর ২১%-এ উন্নীতকরণ, রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চার করে তা বার্ষিক ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ। উক্ত সময়ে মোট রাজস্ব জিডিপি ১০.৭% থেকে ১৬.১%-তে বৃদ্ধি এবং সরকারি ব্যয় জিডিপি এর ২১.১% এ বর্ধিতকরণ। উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত মহাপ্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ করা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে চরম দারিদ্র্য হার নেমে আসবে ৮.৯%-এর কাছাকাছি।

শিল্পায়নে সরকারি নীতিঃ সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) সরকারি নীতি

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে ৮৮.৫ শতাংশ এবং বিদেশি উৎস থেকে আসবে ১১.৫ শতাংশ। মোট বিনিয়োগের মধ্যে সরকারি খাত থেকে আসবে ১২ হাজার ৩০১.২ বিলিয়ন টাকা (১৮.৯%) এবং বেসরকারি খাত থেকে আসবে ৫২ হাজার ৬৫৮.৬ বিলিয়ন টাকা (৮১.১%)। পরিকল্পনার শেষ বছরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে ৮.৫১ শতাংশ। এ পরিকল্পনায় ১ কোটি ১৩ লাখ ৩০ হাজার কর্মসংস্থান (বিদেশে ৩২ লাখ ৫ হাজার) সৃষ্টি হবে। মেয়াদান্তে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে ও অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে দাঁড়াবে, কর-জিডিপি অনুপাত হবে ১২.৩ শতাংশ এবং ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০৮ সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পায়নে সরকারি নীতির যথার্থতা

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পায়নে সরকারি নীতির যথার্থতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পায়নে সরকারি নীতির যথার্থতা

বর্তমান সময়ে কেবল পৃথকভাবে নেওয়া সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন সম্ভবপর নয়। তাই বিশ্বজুড়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশও উন্নয়নের এ নতুন মডেল নিয়ে কাজ করছে।

সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বা যৌথমালিকানায় কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত, পরিচালিত, সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে আয় প্রবাহ নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা Public Private Partnership (PPP) বলে।

এ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

(ক) PPP এর মাধ্যমে বৃহৎ টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ;

(খ) যৌথভাবে বিনিয়োগ ঝুঁকি বহন;

(গ) দীর্ঘমেয়াদি (সাধারণত ১৫-৩০ বছর) প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(ঘ) সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রক্রিয়ায় পণ্য সেবার দাম নির্ধারণ;

(ঙ) নির্ধারিত ফি, চার্জ প্রদানের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ;

(চ) ফি, চার্জ বৃদ্ধির জন্য অংশীদারদের যৌথ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন;

(ছ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা, GDP প্রবৃদ্ধির হার ১০% এ পৌঁছানোই মূল উদ্দেশ্য।

শিল্পনীতি ২০১০-এ যেসব খাতকে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে, তা হলো:

১. সড়ক, রেল, বিমান, নৌ যোগাযোগ ও বন্দর উন্নয়ন;
২. বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি খাতের টেকসই উন্নয়ন;
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত;
৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ;
৫. পর্যটন খাত উন্নয়ন;
৬. শিল্পপার্ক নির্মাণ ও শিল্পায়ন;
৭. আবাসন খাতের প্রসারণ;
৮. গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আহরণ।

পিপিপির অংশীদারিত্ব চুক্তিসমূহ: এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে (ক) যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি, (খ) ব্যবস্থাপনা চুক্তি, (গ) ইজারা চুক্তি, (ঘ) সেবামূলক চুক্তি, (ঙ) মূলধনায়িত চুক্তি এবং (চ) অধিকার চুক্তি সম্পাদন হয়ে থাকে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public-Private Partnership) ভিত্তিতে বিশেষত ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে যেমন মাস-ট্রানজিট (Mass-Transit), ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে ভৌত-অবকাঠামো এবং সেবাখাতে বেসরকারি সনাতন আন্তঃসম্পর্কের (traditional interrelationship) গণ্ডি পেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কৃত্যগত সম্পর্ক (functional relationship) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিশেষত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং সড়ক যোগাযোগ খাতে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে নতুন ও বাড়তি উৎপাদনক্ষমতার সমাহার ঘটিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নে বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে এ খাত সংকটাপন্ন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (BIFFL) নামে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এর অনুকূলে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১০টি খাতে বর্তমানে ৭৮টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আনুমানিক ৩৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হবে।*

বছরভিত্তিক পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা

সাল	২০১২	২০১৫	২০১৮	২০২০	২০২২	২০২৩–২৪*1
প্রকল্পের সংখ্যা	৭	৪২	৬২	৭৯	৭৮	৭৮

২০২৩–২৪ (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) ৭৮টির মধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের সাথে ১৭টি PPP প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে PPP ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে। বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৩

সরকারি নীতির যথার্থতা: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পোন্নয়নে সরকারি নীতির যথার্থতাসমূহ হলো :

১. ব্যাপক পুঁজির সরবরাহ: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের দ্রুত উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে যা এককভাবে সরকার বা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদন করা দুরূহ। এছাড়া, বৈদেশিক ঋণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠিন শর্তযুক্ত, ঢালাওভাবে গ্রহণ সমীচীন নয় বা পাওয়াও যায় না। এরূপ প্রেক্ষাপটে সরকারের PPP উদ্যোগ যথার্থ বলা যায়।

২. ভৌত অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন: দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন বিশেষ করে যাতায়াত ও যোগাযোগ খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ব্যাপক এবং স্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির অপরাপর খাতসমূহও দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে। উন্নয়নের ভিত মজবুত হবে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ: স্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের যৌক্তিকতা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এরূপ প্রকল্প সরকার PPP খাতে হস্তান্তর করে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেহেতু এরূপ শিল্পে বেসরকারি উদ্যোগ, তদারকি, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলো কার্যকর থাকে। তাই সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় PPP এর আওতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অধিকতর বিদ্যমান থাকে।

৫. প্রকল্প ব্যয়: PPP এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে যথাযথ তদারকি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে বিধায় প্রকল্প ব্যয় ন্যূনতম হয়।

৬. সেবাখাতের প্রসারণ: PPP এর মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো খাত মজবুতভাবে বিকশিত হলে এর ফলে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বিমাসহ প্রভৃতি সেবাখাতের প্রসারণ ঘটে।

৭. বেসরকারি খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি: PPP এর মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্পায়ন হলে পরিবহণ ব্যয় থেকে শুরু করে উন্নত কাঁচামাল সংগ্রহ, মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন-বিপণনে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে শক্তিশালী বেসরকারি খাতের সৃষ্টি হয়।

৮. যৌক্তিক পণ্য-সেবার দাম নির্ধারণ: পিপিপি'র আওতায় উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানের পণ্য-সেবার দাম পূর্বেই চুক্তির মাধ্যমে স্থিরকৃত। এরূপ দাম যেকোনো সময়ে পরিবর্তন করা যায় না। মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৯. কর্মসংস্থান: পিপিপির আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশে বেকারত্বের হার হ্রাস পায়।

১০. মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান: বিনিয়োগক্ষেত্রে PPP বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থান, উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়।

১১. সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা: পিপিপি'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগ ক্ষেত্রসমূহে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। এর ফলে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ শক্তিশালী হয়। বাজারে একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস পায়।

১২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: পিপিপি'র আওতায় দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এরূপ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সূচিত হয়। এ কর্মসূচি সফল হলে সহজেই বাংলাদেশ উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে, সন্দেহ নেই।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. নিচের কোন শিল্পটি শুধুমাত্র সরকারি বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত?[ঢা. বো. '২৩]
(ক) হাইটেক শিল্প (খ) সৃজনশীল শিল্প (গ) সংরক্ষিত শিল্প (ঘ) ভারী শিল্প

২. অপসোনিন ঔষধ কোম্পানি একটি- [য. বো. '২৩]
(ক) শিল্প (খ) ফার্ম (গ) প্লান্ট (ঘ) ইউনিট

৩. শিল্পনীতি, ২০১৬ অনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পে সর্বোচ্চ শ্রমিক সংখ্যা কত? [সি. বো. '২৩]
(ক) ৪০ (খ) ৫০ (গ) ৬০ (ঘ) ৭০

৪. মাইক্রোশিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা হলো- [দি. বো. '২৩]
(ক) ৪-৯ জন (খ) ১০-২৪ জন (গ) ২৫-৯৯ জন (ঘ) ১০০-১৫০ জন

৫. জনাব আব্দুল করিম একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করলেন। যেখানে শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী তার বিনিয়োগ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা এবং শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ ১৬ থেকে ৫০ জন। জনাব আব্দুল করিমের শিল্প কারখানাটি কোন ধরনের?
(ক) সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প (খ) ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প
(গ) সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প (ঘ) অগ্রাধিকার শিল্প

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের জন্য কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত?[চ. বো. '২৩]
(ক) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি (খ) তৈরি পোশাক আমদানি
(গ) পরিপূরক শিল্পের বিকাশ (ঘ) মূলধনী দ্রব্য আমদানি

৭. বৃহদায়তন শিল্প বিকাশের ফলে-[চ. বো. '২৩]
(ক) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে (খ) উন্নত উৎপাদন কৌশল ব্যবহার হয়
(গ) আয় বৈষম্য হ্রাস পায় (ঘ) একচেটিয়া কারবার রোধ হয়

৮. Ei'z কী? [ব. বো. '২৩]
(ক) Export Production Zone (খ) Export Promotion Zone
(গ) Export Processing Zone (ঘ) Expand Production Zone

৯. মাইক্রো শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কত? [ব. বো. '২৩]
(ক) ১০ থেকে ১৬ বা তার চেয়ে কম (খ) ৫১ থেকে ১২০
(গ) ১৬ থেকে ৩০ বা তার চেয়ে কম (ঘ) ১৬ থেকে ৫০

১০. সর্বাধিক চা উৎপাদিত হয় কোন জেলায়?
(ক) সিলেট (খ) পঞ্চগড় (গ) রাজশাহী (ঘ) চট্টগ্রাম

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের মাধ্যমে- এর লেখায় ম্যাশীকেসী (ঢা. বো. '২২]

(ক) অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয় (খ) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পায়

(গ) আমদানি ব্যয় কমে আসে (ঘ) দেশীয় উৎপাদকদের উৎপাদন সক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়

১২. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের কত শতাংশ মহিলা শ্রমিক? [রা. বো. '২২]

(ক) ৮০% (খ) ৮৫% (গ) ৯৫% (ঘ) ৯০%

১৩. শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য বিবেচনায় শিল্পকে ভাগ করা হয়েছে- [য. বো. '২২]

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে (গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

১৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয় কত সালের শিল্প নীতির মাধ্যমে?[য. বো. '২২]

(ক) শিল্প নীতি ১৯৮২ (খ) শিল্প নীতি ১৯৮৬

(গ) শিল্প নীতি ১৯৯১ (ঘ) শিল্প নীতি ১৯৯৫

১৫. শিল্প নীতি ২০১০ অনুসারে কুটির শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা কত জন?[য. বো. '২২]

শিল্পনীতি এর পর ২ বার পরিবর্তিত হয়েছে। কেন পিছনের শিল্পনীতি হতে প্রশ্ন করতে হবে? এটি কী ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে?)

(ক) সর্বোচ্চ ১০ জন (খ) সর্বোচ্চ ২০ জন (গ) সর্বোচ্চ ৩০ জন (ঘ) সর্বোচ্চ ৪০ জন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০৩ : বাংলাদেশের শিল্প

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. আজাদ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তার শিল্পে প্রায় ৮০% শ্রমিকই নারী। তার শিল্পের উৎপাদন আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কম-বেশি অবদান রাখছে। তবে শিল্পটির সমস্যাগুলো হলো কাঁচামাল ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা, শ্রমিক অসন্তোষ, ব্র্যান্ডিং সমস্যা ইত্যাদি।[ম. বো. '২৩]

ক. PPP কী?

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়ন প্রয়োজনীয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আজাদের শিল্প এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. রবি গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাড়িতে বেত দ্বারা বিভিন্ন ধরনের চেয়ার, দোলনা ও সোফাসেটসহ অনেক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন। এ কাজে তার স্ত্রী, সন্তান ও ছোট ভাই তাকে সাহায্য করে। উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বাজারে বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জন করে, তা দিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধসহ পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করতে পারেন। তাকে দেখে গ্রামের অনেকেই এ কাজে আত্মনিয়োগ করে।[ব. বো. '২৩]

ক. PPP কী?

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক-ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বেকারত্ব হ্রাস, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টনে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির গুরুত্ব আলোচনা করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে :

ক-শিল্প	খ-শিল্প	গ-শিল্প
মূলধন ৫০ কোটির অধিক শ্রমিক ৩০০ জনের অধিক	মূলধন ৭৫ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি শ্রমিক ৩১-১২০ জন	মূলধন ১০ লক্ষ টাকার নিচে শ্রমিক সর্বোচ্চ ১৫ জন

ক. হাইটেক শিল্প কী?

খ. 'আমদানি বিকল্পশিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক' ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' শিল্প দুটির ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'খ' ও 'গ' শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো ভূমিকা পালন করে কী?

THANK YOU